বড়পীর সাহেবের জীবনী

ও

আশ্চর্য্য কেরামত।

ধর্ম্মবলে বলি লোক জগত মাঝার।
বড়পীরের কেরামতে মুগ্ধ এ সংসার॥

খলিসানি নিবাসী
মৌলবী আজহার আলি কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয় হইতে
মোহাম্মদ সোলেমান ও মোহাম্মদ
আফতাবদ্দীন ও মোহাম্মদ কোমরুদ্দীন
দ্বারা প্রকাশিত।

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

এম্, ডি, প্রেস;

কলিকাতা,—১২ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বর্দ্ধন দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৪ সাল।

বঙ্গের তাপসকুল রত্ন হজরত মওলানা সাহ সুফি
মহাম্মদ আবুবকর সাহেবের প্রদত্ত

সমালোচনা।

আমি কলিকাতা গরাণহাটা ৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ সোলেমানী সুলভ পুস্তকালয়ের সত্বাধিকারি মুন্‌শী মনিরুদ্দীন আহাম্মদ এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত হজরত পিরাণপীর দস্তগীর মহবুবে সোবহানী, গওসে সামদানি সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জিলানি কুদ্দস্ সররহুল আজিজ রহমাতুল্লাহের জীবন চরিত্র ও আশ্চর্য্য কেরামত নামক কেতাব খানির মোটামুটি বিষয় গুলি দেখিয়া ও কতকাংশ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আজকাল এই প্রকার কেতাবের প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। প্রকাশক সাহেব সুযোগ বুঝিয়া ঠিক সময়োপযোগী কেতাব খানি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদের পাত্র। এইরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হইবে ততই সমাজের উপকার হইবে। আমি সর্ব্ব-সাধারণকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মোহাম্মদ আবু বকার আফি আনহু।

আভাষ।

যিনি করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা, ত্রিজগতের অধীশ্বর, তাঁহারই দয়া কৃপা একমাত্র সহায়। আমি যখন খোদাতায়ালার কৃপায় আরবী ও উর্দ্দ গ্রন্থ হইতে হজরত আলি করমুল্লাহে অজহুর জীবনী লিখিলাম তখন অনেকেই তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার সাধুত্ব ও বীরত্বের পরিচয় পাইলেন। কিন্তু জগতে একটী অভাব রহিয়া গেল। বড়পীর সাহেবের জীবনী পাঠ করিতে কেহই পাইলেন না। তজ্জন্য ঢাকা জেলার অধিবাসী ধার্ম্মিক প্রবর মুন্‌শী মোহাম্মদ সোলেমান মিয়া আমাকে বড়পীর সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমি দিল্লি ভ্রমণকালে সেথান হইতে যে পুরাতন গ্রন্থ আনিয়াছিলাম সেই প্রাচীন গ্রন্থকেই আমার সম্বল করিতে হইল। হজরত বড়পীর সাহেবের শিষ্য জনাব মৌলানা শাহ মহাম্মদ এলমোল একিন খোলাফায়ে রাশেদিন হামদানি কাদরি সাহেব সোলতানোল আজকার ও মনাকের গওসোল আবরার গ্রন্থে স্থানে স্থানে আরবী রাখিয়া উর্দ্দু ভাষায় যাহা তছ্‌নিফ করিয়াছিলেন। আমি উক্ত মহাত্মার ঐ প্রাচীন পুরাতন গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় হজরত বড়পীর সাহেবের জীবনী লিখিলাম। তবে যদি বড়পীর সাহেবের কোনরূপ কেহ পুস্তক লিখিয়া থাকেন তাহাতে সম্পূর্ণ নাই বড়পীর সাহেবের দশ বিশটা কেরামতের কথা লেখা থাকিতে পারে এইমাত্র। কিন্তু এই গ্রন্থে সনদের সহিত বড়পীর সাহেবের বাল্যকাল হইতে পরলোক গমনের শেষে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও লিখিত হইয়াছে। এখন আশা করি পাঠক পাঠিকা বড়পীর সাহেবের জীবনী পাঠ করিয়া সন্তোষ হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বিনীত—শেখ আজহার আলি।
এস্‌লাম প্রচারক।

হজরত বড়পীর সাহেবের জীবনী

বা

আশ্চর্য্য কেরামত।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি অনন্তময় যিনি বিশ্ব জগতের অধীশ্বর, সেই দাতা দয়ালু নিরঞ্জন নিরাকার নিজ মহাত্ম্য প্রকাশ করিবার মানসে এক অপূর্ব্ব মনোহর জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে আরশ, কুরশি, লহোহ্, কলম, স্বর্গীয় দুত, স্বর্গ, মর্ত্ত, আকাশ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য, রাত্রি, দিবা, উজ্জ্বল, অন্ধকার, গ্রহ-উপগ্রহ, রাহু, কেতু, নক্ষত্র, বিদ্যুত, সাগর, সলিল, নদ, নদী, অগ্নি, বায়ু, গিরি, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রান্তর, তৃণ, লতা, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, দেব, দৈত্য, ভুচর, খেচর, দানব ও মানব ইত্যাদি সকল প্রাণীর সৃজন করিয়াছেন। তৎকারণেই সেই অদ্বিতীয় বিশ্ব-পালক সৃষ্টি কর্ত্তারই সর্ব্ববিধ প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য। সকল মনুষ্যমাত্রেই এই ধরাতলে আসিয়া একমনে একধ্যানে নিরঞ্জন নিরাকারের উপাসনা, অর্চ্চনা করিতে

করিতে, সত্যধর্ম্মে থাকিতে থাকিতে, পৃথিবীর মায়ায় ভুলে, ঐশ্বর্য্যের মদগর্ব্বে, প্রিয়জনের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, কু প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ভ্রমান্ধে পড়িয়া নানাবিধ দেবদেবী প্রতিমা, মূর্ত্তি সকলের পূজা উপাসনা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। দয়াময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পৃথিবীর শেষ যুগে মনুষ্যের মতি গতি দর্শন করিয়া, পাপীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়াদ্র হৃদয়ে শেষ প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা মহাম্মদ (সঃ) কে জগতে পাঠাইয়া দিলেন। যে কালে পূর্ব্বে আরব দেশের অন্তর্গত মক্কানগরে মহাত্মা মহাম্মদের (দঃ) আদি পুরুষ একেশ্বর ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা এব্রাহিম (আঃ) বাস করিয়া বিশ্ব পালকের আদেশানুসারে পবিত্র কাবা শরিফ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত জগতের লোককে ঐ কাবা শরিফে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার নিরূপম নিরঞ্জন জগত পালকের উপাসনা করিবে নির্দ্ধারণ করিয়া একটী মহাশব্দ শুনাইয়া ছিলেন, তাহাতে বহু দেশের লোক আসিয়া পবিত্র কাবা শরিফের মধ্যে একেশ্বর খোদা-তায়ালার উপাসনায় সকলেই নিযুক্ত হন। ক্রমে সেই পবিত্র কাবা শরিফ হইতে অদ্বিতীয় একেশ্বরের উপাসনা অর্চ্চনা বিলুপ্ত হইয়া পড়িল এবং সেই কাবাতে নানাবিধ প্রতিমা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া জন সাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত

হইতে থাকে, দেখিতে দেখিতে সমুদয় আরব বাসীগণ জড়োপাসক হইয়া, মুর্ত্তি পূজাতেই মনোনিবেশ করিলেন। এমন কি তাহারা তিন শত যাট প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নামের দেব দেবীর মুর্ত্তি গঠিয়া তাহাদেরই আরাধনা পূজা উপাসনা করিতে নিযুক্ত হয়। ঐ সময়ে পবিত্র মক্কা নগরে উচ্চগামী কোরেশ বংশে হজরত মহাম্মদ (সঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি তেতাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত একশ্বরবাদ ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার এবং কাবাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করিয়া, হজরত জ্বলন্ত উৎসাহের বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। পুনঃ পবিত্র কাবায় এক অদ্বিতীয় বিশ্ব পালক খোদা-তায়ালার উপাসনা করাইতে এবং দিন এসলাম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমাবস্থায় হজরত আলি করমুল্যা অজহু এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ পুর্ব্বক হজরতের প্রচার সাহায্যে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। আলি করমুল্যা অজহুর বাল্যকালে সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতে কয়েকজন কোরেশ ও হাশেম বংশীয় বিশ্বাসী প্রৌঢ়, যুবা ও বীরপুরুষগণ ক্রমে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহার সত্য ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করেন। তন্মধ্যে আবুবকর, ওমর ফারুক, হজরত ওসমানগণি, আলি করমুল্য আজহু ও মহাবীর হজরত হামজা ইহারা প্রধান

ছিলেন। যখন মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ (সঃ) সদলে মক্কা নগরে এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে অংশীবাদী পৌত্তলিক জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত দশ বৎসর পর্য্যন্ত অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া নানা কষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন। পরে বিধর্ম্মীদের নিদারুণ নিপীড়নে হজরতের মক্কায় বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। অবশেষে মদিনাবাসীদিগের আহ্বানে সহচর সহ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে যাইয়া আশ্রয় লন। মদিনাবাসীগণ হজরতকে সবান্ধব সহ আশ্রয় দিয়া, তাঁহার স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং এস্‌লাম ধর্ম্মের সত্যতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, সকলেই এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আনসার ও মহাজেরগণ নানা উপায়ে এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারে হজরতের সাহায্য করিতে বদ্ধ পরিকর হন। তাঁহার মধুর উপদেশালোকে কোটী কোটী পাপীর অন্তরের পাপ তিমির দুরীভূত হইয়া ভীষণ নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল, সেই এস্‌লাম ধর্ম্মের পূর্ণজ্যোতিতে সকলেই পুণ্যবান হইয়া জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অবশেষে মক্কানগর জয় করিয়া কাবা শরিফের মধ্যস্থিত মূর্ত্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ একমাত্র খোদাতায়ালার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কত কত লোক হজরতের

দয়া ও স্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া, অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রায় সমুদয় আরববাসী এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং সমুদয় আরবদেশ হইতে প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত হইয়া, একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকারের পূজা ও উপাসনা হইতে লাগিল। হজরত মহাম্মদ (সঃ) দশবৎসর মাত্র মদিনায় বাস করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিলেন। হজরতের পরলোকান্তে তাঁহার চারিজন প্রচার বন্ধু খলিফার পদ প্রাপ্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে এস্‌লাম ধর্ম্মের পুনর্জ্যোতি বৃদ্ধি করেন। কিন্তু হজরত আলি করমুল্যা অজহুর নেতৃত্ব কালের শেষ সময় হইতে, খারেজীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়া দিন এস্‌লামকে জ্বরাজীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার পরে হজরত হোছেনের সময় কালে এজিদ দামেস্কের বাদসাহ হইয়া, মোস্‌লেম গণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে রাফজি ও শিয়া দল গঠিত হইয়া বিদ্বেষ বশত, ঐ সময় হইতে ক্রমে চারিশত বৎসর মধ্যে দিন এস্‌লামকে জ্বরাজীর্ণ করিয়া, এস্‌লাম মণ্ডলীকে হীন অবস্থায় পরিণত করিল।

পরম করুণাময় দাতা দয়ালু পুনর্ব্বার দিন এস্‌লামকে নববলে বলিয়ান করিবার জন্য পরম পবিত্র সৈয়দ বংশ হইতে হোসেন কুলে, পরম তাপসিক ঋষিকুল শ্রেষ্ঠ

অদ্বিতীয় এক মহানুভব মহাত্মার সৃষ্টি করেন এবং সেই মহাত্মাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করত, পির দস্তগির, আব্দুল-কাদের মহিউদ্দিন জ্বিলানী নামে অভিহিত করিয়া, কাদ্‌রিয়া তরিকার নেতা করিয়া এই ধরাতলে ধর্ম্মের সত্যতা দেখাইতে প্রেরণ করেন। তিনি সত্য পথভ্রষ্ট পথিকের পথ প্রদর্শকের জন্য এস্‌লাম ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক হস্তে করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাঁহার উপদেশালোকে মহামহা পাপী জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিবরের চরণ যুগলে আশ্রয় লইয়া শান্তি লাভ করিল। এমন কি চোর, দস্যু, ভণ্ডঋষি, জালেম ও লম্পট পর্য্যন্ত পবিত্র চরণ কমল স্পর্শ করিয়া, পবিত্র হইতে পবিত্র হইয়া তাঁহারাও শত শত পাপীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়া লোকে যারপর নাই সন্তোষ হইয়া, ঐ চরণ কমলে বিনামূল্যে বিকাইয়া যাইত। যাঁহার অলৌকিক কেরামত দর্শন করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, মুখে কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ নাম জপ করিতে করিতে, পুত্র পরিজন ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য বেশে দেশ দেশান্তরে ও নিবিড়বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সেই মহাপুরুষ তাপস প্রবরের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কতদূর যে কৃতকার্য্য হইতে

পারি, তাহা সেই অন্তর্য্যামী দয়াময়ই বলিতে পারেন এবং পীরের চরণকমলে ভক্তি রাখিয়া লিখনি চালনা করিলাম।

শান্তি।

পরম তাপস প্রবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষিকুল-চূড়ামণির নাম লইতে হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া যায়, তাপিত প্রাণ শীতল হয়, দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ হইয়া, প্রেম শ্রোতে অঙ্গ ভাসিয়া বেড়ায়। যে নাম লইলে কোটী কোটী পাপীর পাপতিমির দূরীভূত হয়। যে নাম লইতে মুসলমান ও হিন্দু সমাজ ত্রাসিত চাতকের মত হজরতের সমাধী স্থান বোগ্দাদ শরিফ দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। যে নামের গুণে ধনী, নির্ধনী, আমির, ফকির, অনাহারী, ভিক্ষুক, তাপসগণ বিজন-বনে গহন-কাননে নির্ভয়ে বাস করে। যে নামের গুণ কীর্ত্তনে বন, জঙ্গল, নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর, প্রান্তর, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, ফল, ফুল, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী, রাজা, প্রজা, সকলেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সেই নামের বর্ণনা কথঞ্চিত্ত কবিগণে আপন আপন গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যথা—

হজরত মহবুবে সোব্হানি, কোতোবে রব্বানি, নুরেই-

জাদানি, গওসে সামদানি মহিউদ্দিন জ্বিলানি, সৈয়দ আব্দোল কাদের গিলানি, পীরদস্তগির আফজোলোল্ আওলিয়া এই সকল বড়পীরসাহেবের গুণকীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং যে স্থানে সালেহিন মহর্ষিগণের মহিমা বর্ণনা করা হয়, সে স্থানে দয়াময় খোদাতায়ালার দয়া বারি বর্ষণ হইয়া থাকে, সেই জন্য মহামহা সাধু পুরুষগণে এই আরবী বচনটী পাঠ করিয়া গিয়াছেন।

তানজ্জিলোর্‌রহমাত এন্‌দা জেকরেচ্ছালেহিন।

অর্থ

যে স্থানে সালেহীন সাধু পুরুষগণের মহিমা বর্ণনা হয়, নিশ্চয় সেই স্থানে খোদাতাযালার শান্তি বারি বর্ষণ হইয়া থাকে।

ভবিষ্যৎ বাণী।

একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় ভীষণ সূর্য্যের কিরণ তাপে মরুময় আরবদেশ ধূ ধূ করিতেছে, কেবল বালুকা-রাশি হইতে কুয়াসার ন্যায় অগ্নিময় ধূমরাশি বাহির হইতেছে। পথে ঘাটে জনমানবের গতিবিধি নাই। প্রখর সূর্য্য কিরণে আরবদেশ যেন একেবারে জনপ্রাণী শূন্য হইয়াছে; সে সময় কোন খানেই কোন পশু পক্ষীরও গমনাগমন দেখা যায় না। কেবলমাত্র মদিনা-

নগরের রাজপুরীর বহির্ভাগে একটী বৃক্ষ তলায় ম্লান বদনে তিনজন মহাপুরুষের আগমন, তাঁহারা সেই বৃক্ষ তলে বসিয়া একটু সুস্থ হইলেন। পাঠকগণ চিনিতে পারিয়াছেন কি ইহারা কে? ইহাঁদের মধ্যে একজন ভবপারের কর্ণধর হজরত মহাপ্রভু মহাম্মদ (সঃ) দ্বিতীয় ভ্রাতৃদ্বয় হজরত ফাতেমার উজ্জ্বল রত্ন কণ্ঠহার হৃদয়ের মানিক হজরত হোসেন ও হাসেন, মাতামহের দুই পার্শে বসিয়া মনে মনে যেন কি চিন্তা করিতেছেন। হজরত রছুলে করিম (সঃ) ভ্রাতৃদ্বয়কে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। হজরতের সরল প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আর তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে এমাম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস হোসেন! কেহ যদি তোমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, কিম্বা তোমাকে অন্যায় করিয়া কষ্ট দেয়, তখন তুমি তাহার প্রতি সৎ ব্যবহার কি অসৎ ব্যবহার করিবে।” তখন হজরত এমাম হাসেন মাতামহকে বলিলেন, “হে পতিত পাবন অধম তারণ রহমাতুল্লেল আলামিন! যে আমাকে বিনা কারণে প্রহার করিবে কি আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাকে আমি একবার দুইবার ক্ষমা করিব; কিন্তু তৃতীয় বারে নিশ্চয় তাহার পরিশোধ গ্রহণ করিব। মানব কি দানব হইলেও

আমার করে তাহার রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই তাহার অধঃপতন হইবে। যদ্যপি সে সাগর সলিলে, বন জঙ্গলে, গিরীগুহায় লুকাইত হয় তথাপি তাহার নিস্তার নাই। তৎপর হজরত রসুলে করিম (সঃ)—এমাম হাসানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ হাসান! তোমার সহিত যদি কেহ শত্রুতাচরণ করে, কিম্বা বিনা কারণে তোমাকে বিপদগ্রস্ত করে, তখন তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে কি না?" হজরতের প্রতি উত্তরে হজরত মহর্ষি এমাম হাসান কহিলেন, হে মাতামহ পূজ্যপদ মহাপুরুষ, যদি কেহ আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া অসৎ ব্যবহার করে, আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সৎ ব্যবহার করিব, এবং তাহাকে অসৎ পথ হইতে সৎপথে আনয়ন করিয়া বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ করিব, কখনই তাহার প্রতি কোপদৃষ্টে চাহিয়া দেখিব না। হাসনের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া, হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) প্রফুল্লচিত্তে সন্তোষ হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন। হে ভ্রাতৃগুণাধর, ফাতেমার অমূল্য নিধি! তোমার ঐ সৎকর্ম্মের পরিবর্ত্তে অবশ্যই আল্লাহ্‌তায়ালা কৃপা করিয়া তোমার পবিত্র বংশে, এক পরম শ্রেষ্ঠ তাপসিক সালেহিনকে প্রেরণ করিবেন, তিনি জগৎমধ্যে আরাধ্য দেবতা হইয়া পাপীগণকে উদ্ধার করিবেন। সকল

সাধুগণ তাঁহার দুর্লভ চরণ যুগল লইয়া আপনার স্কন্ধে ধারণ করিয়া সকলেই ধন্য হইবে এবং সেই সময় স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ হইয়া জগতের সাধুদিগকে পুলকিত করাইবেন। সে সময় সকল মহর্ষি অলি আল্লাগণ তাঁহার কৃপাদৃষ্টির প্রার্থী হইয়া থাকিবে। জগতের সাধুপুরুষগণ তাঁহার নিকট হইতে গুপ্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া জগতবাসীদের নিকট সর্ব্বদা সম্মানিত হইয়া রহিবে। ধন্য তাঁহারই ধন্য যাঁহারা গওসোলআজম আব্দুল কাদের জিলানির পদ দুখানি লইয়া আপন আপন স্কন্ধে ধারণ করিবে। অধম লেখক বলেন, যদি স্বপ্নেও কখন ও পদ স্কন্ধে ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি।

একদিন হজরত হাসান রাজি আল্লাহুতায়ালা আনহো নির্জ্জন গৃহে পরম করুণাময় বিশ্বপালকের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। হাসানের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত জগৎ শান্তিময় ধারণ করিয়াছে তাহা তিনি দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। তাপস প্রবর ধ্যানযোগে ঊর্দ্ধোদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, আরশের দক্ষিণভাগে জ্যোতির্ময় একটী উজ্জ্বল বস্তু স্বর্গ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। সেই সুবিমল জ্যোতিঃতে সমগ্র স্বর্গের দূতগণ আনন্দে অধীর হইয়া বিভু সন্নিধানে করজোড়ে মঙ্গল কামনা

করিতেছেন। তিনি সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া, বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উজ্জ্বল রত্ন তুমি কে এবং কি জন্যই বা আরশ মধ্যে বিরাজমান করিতেছ, তাহা বলিয়া আমার মনের বিকার দূর করিয়া দাও। তখনই কৃপাময়ের কৃপায় ঐ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু হইতে শব্দ হইল, হে সাধু-প্রবর! আমরা বহুপ্রাণী একত্রিত হইয়া ঈশ্বর গুণগানে নিযুক্ত আছি, আলি করমুল্যা অজহুর বংশে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশ মধ্যে নয় জন এমাম জন্ম গ্রহণ করিবে, অবশিষ্ট একভাগ তোমারি বংশে একজন এমাম বা কোতব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া, খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে দয়াময় বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্ত্তা ইঁহাদের আদি বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এ দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। দয়াময় ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিলেন, হে আমার বান্ধবের বন্ধু! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনের বংশে নয়জন এমাম জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং অবশেষে তোমার বংশে আমার এক পরম বন্ধু তাপস শ্রেষ্ঠ এমাম ও কোতব হইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ দিন এস্‌লামকে নব বলে বলিয়ান করিয়া তুলিবে।

প্রভু কর্ত্তৃক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া হজরত হাসান আনন্দ হৃদয়ে সেই দিনে স্ত্রী-সহবাসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই খোদাতালার কৃপায় হজরত হাসান (রাঃ) ঔরসে আব্দোল্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তজ্জন্য বড় পীর সাহেবের পিতৃ পুরুষগণের নাম একে একে বর্ণনা করা হইল।

(১) এমাম জয়নাল আবেদিন, (রাজিঃ) ২ এমাম মহাম্মদ বাকের (রাজিঃ), ৩ এমাম জাফর ছাদেক (রঃ) ৪ এমাম মুসি কাজেম (রঃ), ৫ এমাম মুসি আলি রেজা (রঃ), ৬ এমাম জোয়েদ (রঃ), ৭ এমাম আলি আস্করি (রঃ), ৮ এমাম হাসন খালেছ (রঃ), ৯ এমাম মেহ্দি আলায়হেচ্ছাল্লাম এই নয়জন এমাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাসিন বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই এমামগণের আমার লিখিত জীবনী দেখিলেই সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন।

হজরত বড়পীর আব্দল কাদের জ্বিলানীর পিতৃপুরুষগণের নাম।

হজরত মহিউদ্দি আব্দোল কাদের জ্বিলানী (রঃ) পিতা হাসেন ও হোসেনী ইনি সৈয়দ বংশে পরিচিত

ইঁহার আদি পিতৃপুরুষ হজরত আলি করমুল্যা অজহু ১ ইঁহার পুত্র এমাম হাসান রাজি আল্লাহু আনহো ২। উঁহার পুত্র সৈয়দ আব্‌দোল্যা ৩। সৈয়দ আব্‌দোল্যার পুত্র মুসাল জুন ৪ তৎপুত্র সৈয়দ আব্দুল সানি (রঃ) ৫। তৎপুত্র সৈয়দ মুসা (রঃ) ৬। তৎপুত্র সৈয়দ দাউদ (রঃ) ৭। তৎপুত্র সৈয়দ মহাম্মদ (রঃ) ৮। তৎপুত্র সৈয়দ জাহেদেহি (রঃ) ৯। তৎপুত্র সৈয়দ আবু আব্‌দোল্যা (রঃ) ১০। তৎপুত্র সৈয়দ ছফিউদ্দিন (রঃ) ১১। তৎপুত্র সৈযদ আবুসালে মুসা জঙ্গি (রঃ) ১২। ইঁহার পুত্র সৈয়দ আব্‌দোল কাদের মহিউদ্দিন জিলানি কুদ্দস্ সরহুল আজিজ রহমাতুল্যাহে।

হজরত বড় পীরের জন্ম বিবরণ।

অদ্বিতীয় তাপস শ্রেষ্ঠ সাধু প্রবর মহাত্মা গওসল আজম মহ্‌বুবে সোবহানি আব্‌দোল কাদের গিলানী চারশত একাত্তর হিজরীতে পুণ্যভুমি গিলান সহরে সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আবুসালে মুসা জঙ্গি (রঃ) ও পরম সতী সাধ্বী সদ্‌-গুণবতী সৈয়দ বংশীয় রমণী রত্ন। আব্‌দোল্যা জোয়ে-বের কন্যা বিবি উম্মালখায়ের ফাতেমা ইঁহার জননী বা

গর্ভ ধারিণী মাতা। এই খনি পানের ও প্রস্ফুটিত সুগন্ধ যুক্ত ফুল সৈয়দ বংশে মাতৃগর্ভে যখন অবতীর্ণ হইল তখন উম্মাল খায়ের ফাতেমার ষাট বৎসর বয়েস। তিনি প্রবীণা বেশ ধারণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু অদ্বিতীয় সাধু পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিয়া, কুমুদিনীর মত বিমল ছটায় গিলান ভূমিকে বিমুগ্ধ করিয়া জগৎবাসী দিগকে পুণ্যের জ্যোতিঃ ছড়াইতে লাগিলেন। ফাতেমার প্রথম মাসে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে স্বপ্নে হজরত হাওাবিবি আসিয়া কহিতে লাগিলেন। ফাতেমা খায়রোন নেসা। জগতে তুমিই ধন্যা, তোমারি পবিত্র গর্ভে গওসল আজম স্থান পাইয়াছেন। দ্বিতীয় মাসে হজরত এব্রাহিম (আঃ) পত্নী বিবি সারা খাতুন স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, হাসন বংশের গুণবতী রমণী। তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার পবিত্র গর্ভে নুর আজম জগৎ গুরু, গুপ্ত তত্ত্বের সংবাদ দাতা স্থান পাইয়াছেন, এই বলিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। তৃতীয় মাসে বিবি আসিয়া স্বপ্নযোগে কহিলেন, তোমাকে আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, সাবধান হও, তোমার গর্ভে রৌসন জমির স্থান পাইয়াছেন। চতুর্থ মাসে ইসা নবির মাতা বিবি মরিয়েম স্বপ্নযোগে দেখা দিলেন, তৎপরে কহিলেন, তোমার ঐ গর্ভে জগতের

পূজ্যপাদ মহান সাধু পুরুষ স্থান পাইয়াছেন। পঞ্চমাসে শেষ নবি প্রেরিত পুরুষের পত্নী; বিবি খোদেজা কেব্রিয়া রাজি আল্লাহ্ আনহা স্বপ্নযোগে কহিলেন, তুমি গর্ভবতী আছ এবং তোমর ঐ গর্ভে দিন এস্লামের উজ্জ্বল রত্ন মহিউদ্দিন জিলানি বিদ্যমান রহিয়াছেন। ষষ্ঠ মাসে হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ্ আনহা স্বপ্নে আসিয়া কহিলেন, যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাগুণে জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, সেই মহা পুরুষ তোমার ঐ পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইবেন। সপ্তম মাসে মহাবীর হজরত আলির সহধর্ম্মিনী ফাতেমা জোহরা স্বপ্নে দেখা দিলেন, পরে হাস্য বদনে কহিলেন যে, সৈয়দ কাননের প্রস্ফুটিত গোল প্রকাশ পাইবে এবং সে সময়ে অলিকুল আওলিয়াগণ মত্ত হইয়া তোমার ঐ আদরের ধনকে যত্ন করিবেন। অষ্টম মাসে হজরত হাসান পত্নী জয়নাব স্বপ্নযোগে কহিলেন, তোমার গর্ভে যে সাধু পুরুষ জন্ম লইয়াছেন, উনি দিন এস্লামকে নববলে বলিয়ান করিয়া তুলিবেন। ঐ সাধু পুরুষের যশঃগান কাননের বিহঙ্গম কুল পর্য্যন্ত শাখায় প্রশাখায় বসিয়া গান করিতে থাকিবে। নবম মাসে হজরত হোসেনের সহধর্ম্মিণী স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন, হে গুণবতী রমণী রত্ন ফাতেমা খায়রননেসা! সাবধান হও, সর্ব্বদা সতর্কে থাকিও; শুভসময় উপস্থিত

আর অধিক কাল বিলম্ব নাই তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে জগতারাধ্য ধন প্রকাশ পাইবেন এবং গিলান নগরের গৃহে গৃহে সুখের হিল্লোল প্রবাহমান হইবে। আজ পিরান পীরের মাতা সাহেবাণীর কি পরম সৌভাগ্য, যাহা জগতের কোন রমণী সাধ্বী সতীর ভাগ্যেও ঘটে নাই, আজ ফাতেমা সাহেবাণীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল, দেখ স্বর্গের দেব নারীগণ মাসে মাসে আসিয়া শুভ সংবাদ দান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ধন্য, গওস মাতাই ধন্য, দেখুক জগতের পাপীগণ সাধুপুরুষ-গণের কীর্ত্তি কাহিনী দেখিয়া যেন সেই জগত পালক খোদাতায়ালাকে শত শত ধন্যবাদ দেয়।

বড়পীর সাহেব গর্ভে থাকিয়া ব্যাঘ্ররূপে বাহির হইয়া একজন লম্পটকে সংহার করেন।

আজ পিরান পীরের মাতা সাহেবাণী পবিত্র গর্ভে উজ্জ্বল রত্নের স্থান দিয়া, আনন্দ সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আবার সময়ে সময়ে মনে মনে কত কি ধারণা করিতেছেন। হায়, কখন আমার ভাগ্য আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে, কতদিনে গর্ভস্থিত

বালককে প্রসব করিয়া, তাঁহার চন্দ্রমুখ দর্শনে সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি পাইব। হায়, আমার সে সৌভাগ্য কবে হইবে যে, বৃদ্ধ বয়সে ছেলের মা হইয়া, বৎসকে ক্রোড়ে করিয়া স্নেহভরে আদর ক'রে বালকের মুখচন্দ্রিমায় লক্ষ লক্ষ চুম্ব দান করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব। আমি যাহা স্বপ্নে দর্শন করিতেছি, ইহাকি সত্য, হা! সকলই সত্য, যখন নয় মাসের গর্ভ হইয়াছে নিশ্চয় বিধাতার কৃপায় সন্তানের মুখ দেখিয়া মহা আনন্দে আনন্দিত হইব। হায়, কালের কি কুটিল গতি, দৈব বিড়ম্বনা কি ভয়ানক ব্যাপার, অদৃষ্ট দেবীর কি চঞ্চলা স্বভাব, গ্রহ নক্ষত্রের কি ভয়ানক দৃশ্য, কাহার ভাগ্যে যে কখন কি ঘটে কে তাহা বলিতে পারে। গ্রহতারা ছায়ারূপে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ গ্রহ-তারা প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ফাতেমা সাহেবাণীর অদৃষ্ট পথে উদয় হইল। হঠাৎ দ্বারদেশে একটী ভিখারী ফকির আসিয়া ইলাল্লা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে একটী জিকির ছাড়িল। তৎসঙ্গে সঙ্গেই বলিল, বাটীতে কে আছে গো? দ্বারে অনাহারী ভিক্ষুক ফকির মিসকিন দণ্ডায়মান। যদি কেও আল্লার বান্দা থাকত, দয়া করিয়া ক্ষুধার্থ ফকিরের সংবাদ লও। বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আর সহ্য

করিতে পরিনা। ছাই উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। যে সময় ফকির জিকির করিতেছিল, সে সময় কেবল মাত্র বড়পীরের মাতা সাহেবাণীই বাটীতে ছিলেন। কেইবা অনাহারী ফকিরের তত্বাবধান করে, কেইবা তাহার সওয়ালের জওয়াব দেয়, সমস্ত মহল নিস্তব্ধ একটী প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। ফকির বাটী হইতে কোন লোকের শব্দ না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, কি আশ্চর্য্য এমন আলিসান মহল হইতে কেহই এই গরিব মিস্‌কিন ফকিরের কথার উত্তর দিল না এবং আমার দুরাবস্থার প্রতি চাহিয়াও দেখিল না। হা দুরাদৃষ্ট ভাগ্য, একটু পানি পাইলেও জল পিপাসা নিবারণ করি, আরত আমার চলিবার শক্তি নাই হায়, হায়, অতিথির মুখের দিকে কেহই ফিরে চাহিল না; সোবহানাল্লা! আবার দম ফেলিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, এ আলিসান মহলে কে আছ গো? অনাহারী ক্ষুধার্থ ফকিরকে কিছু খাইতে দিয়া প্রাণরক্ষা কর। আমি তোমাদের বাটী হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে, তোমরা খোদার কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে, রোজ কেয়ামতে কি বলিয়া জওয়াব দিবে, তোমাদের কি পাপের ভয় নাই আহা! দয়াদ্রে-হৃদয়া সরল অন্তরা স্নেহময়ী পিরান পীরের মাতা সাহেবাণী,

ফকিরের কাতর ও করুণস্বর আর সহ্য করিতে না পারিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে কিঞ্চিৎ আহার্য্য বাসনে লইয়া সেই দুষ্ট ফকিরকে হাত বাড়াইয়া দিতে গেলেন। যে সময় হজরত ফাতেমা খায়রননেসা আহার্য্য লইয়া দেন, সেই সময় ফকির বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, এ মহলে একটী রমণী ব্যতীত আর অন্য কেহই নাই। তখন লম্পট ফকির কু-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার মানসে স্ববলে ফাতেমার অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। ফাতেমা লম্পট ও ভণ্ড ফকিরের দুরাশা দেখিয়া সতীত্বনাশের ভয়ে একাকী অন্দর মহলের কোণে যাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, এবং মুখে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন, হে বিশ্ব পালক অন্তর্য্যামী করুণাসিন্ধু তুমি আমার অন্তরের সকল ভাবই অবগত আছ, এ সময় কৃপা করিয়া এ নিঃসহায়া কিঙ্করীকে নির্জ্জন গৃহে রক্ষা কর। সে সময় হজরত গওসল আজম পিরান পীর রহমাতুল্যা আলায়হে পবিত্র-গর্ভে থাকিয়া মাতার এ ভয়ানক বিপদ দর্শন করিয়া, আর নিশ্চিন্ত ভাবে মাতৃগর্ভে থাকিতে পারিলেন না, তখনই হজরতের পবিত্র আত্মা মাতৃগর্ভ হইতে অদৃশ্য হইয়া লয়হ মৌফুজে উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ

দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যাঘ্র মুর্ত্তিতে ভণ্ড ফকিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সে দুষ্ট ফকির অকস্মাৎ ব্যাঘ্র দেখিয়া, প্রাণভয়ে চীৎকার ছাড়িতে লাগিল, কিন্তু অধিক্ষণ আর চীৎকার করিবার সময় পাইল না। সেই ব্যাঘ্রের হাতেই প্রাণ হারাইয়া পঞ্চত্ব পাইল। দুষ্টের দুরভিসন্ধির প্রতিফল হাতে হাতেই ফলিয়া গেল।

হজরত আবুদুল কাদের মহিউদ্দিন জ্বিলানী রহমাতুল্যা আলায়হে যে সময় মাতৃগর্ভ হইতে অদৃশ্য হইয়া, ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ ফকিরের প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় মাতৃ-গর্ভে ছিলেন, তাহা তাঁহার মাতা সাহেবাণী জানিতেন না। যখন হজরত বড়পীর সাহেবের বয়স আট বৎসর মাত্র, সে সময় তাঁহার মাতা কোন কারণ বশতঃ রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, রে দুরন্ত বালক। আমার স্নেহ একবারেই কি বিস্মরণ হইয়াছ। মায়ের কথায় এরূপ ভাবে তিনি প্রতি উত্তর করিয়াছিলেন যে, মাত! আমার উপকার কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। যেদিন তুমি একাকী ফকির হস্তে পতিত হইয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য নিরূপায় হইয়া পড়িয়াছিলে, সে সময় আমি তোমার গর্ভ হইতে অদৃশ্য হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ সেই দুষ্ট ফকিরের

প্রাণবধ করিয়া তোমার কি উপকার করি নাই ? তাঁহার মাতা পুত্রের মুখে, তাঁহার এরূপ অলৌকিক ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং গুণধর পুত্রকে শত শত বার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চার শত সত্তর বা একাত্তর হিজরীর উনত্রিশে সাবান মাসের সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে ঘোরতর মেঘের উদয় হইল। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল, শোঁ শোঁ করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, কখন কখন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল, তথাপিও লক্ষ লক্ষ লোক রমজানের চন্দ্র দেখিবার জন্য, উৎসাহের সহিত একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু আকাশে নব মেঘের ঘটায় গিলানবাসীরা পবিত্র রোমজান শরিফের চন্দ্র কেহই দেখিতে পাইলেন না। হতাশ হইয়া গৃহবাসীরা স্ব স্ব গৃহে রাত্রিকালে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রিতে মেঘের গভীর গর্জ্জনে, কাহার বা নিদ্রা হইল কাহার বা নিদ্রা হইল না। এমন দুর্গম রাত্রির মধ্যে গিলান নগরে ফাতেমা দেবী একটী কুটির মধ্যে প্রসব যাতনায় অস্থির হইয়া ছট ফট করিতেছেন। প্রতিবাসী রমণীগণ আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। কিন্তু কষ্টের রজনী শীঘ্র প্রভাত

হইতে চায়না যেন কতই ভার বোধ হইতে থাকে। তথাপি পরিণাম কাহার না আছে? শৈশবের পর যৌবন, রোগের শেষে আরোগ্য, অন্ধকার অমানিশার পর পূর্ণিমার জ্যোতিঃ, রাত্রির শেষে দিবা, কষ্টের পর সুখ; সেইরূপ ফাতেমা দেবীর দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়া সুখের দিবা উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মাতৃগর্ভ হইতে হজরত গওসল আজম ভূমিষ্ঠ হইয়া, হজরত রসুলে করিম (সঃ) মের উম্মতের জন্য মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

একজন গিলানবাসী মহাজ্ঞানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন উম্মল খায়ের ফাতেমা দেবীর একষট্টি বৎসর বয়েস, সেই সময় তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সকল গ্রন্থকর্ত্তার মতে, হজরত ফাতেমা সাহেবাণী, চার শত সত্তর বা একাত্তর হিজরীর রোমজান মাসের প্রথম দিবস সোমবার দিনে ভোরের সময় একটী পুত্র রত্ন প্রসব করেন। ফাতেমা খায়রন নেসা শুভদিনে শুভক্ষণে নিরূপম রূপলাবণ্য যুক্ত পুত্র রত্ন লাভ করিয়া অসীম আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। জগতারাধ্য ধন মহান সাধু পুরুষকে ক্রোড়ে পাইয়া মাতা যেন আজ আকাশের পূর্ণ চন্দ্রকে নিজ ক্রোড়ে পাইলেন। মর্ত্তে বাস করিয়া যেন স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন,

দরিদ্র ব্যক্তি যেন গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। সন্তান বৎসলা জননী স্নেহভরে পুত্রের মুখে শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন, পিয়ান পীরমাতা অমূল্য রত্ন কোলে পাইয়া জগতের সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া অনিমেষ নয়নে পুত্রের মুখচন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের মাতা সুকুমার নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, যেন আকাশের শশধরকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন বলিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। আবু সালেহের পুত্র হইয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন বর্গ শিশুবরকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সকলে বালকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, স্বর্গীয় রূপ জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তিতে মাতৃক্রোড় আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। একশত পূর্ণচন্দ্রের বিমল ছটায় যত না সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, শিশুবরের মুখচন্দ্র ততোধিক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার আজানু-লম্বিত সুকোমল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নদ্বয়, স্কন্ধে রসুলের পদচিহ্ন (১) রক্তজবা রাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ হইতে যেন কৃপাময় বিশ্ব পালকের গুণ কীর্ত্তন স্তব স্তুতি

(১) হজরত রসুল করিম (সঃ) মাতৃগর্ভ হইতে পৃষ্ঠদেশে মহরে নবু-ওয়াতের চিহ্ন আনিয়াছিলেন। আর বড়পীর সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে হজরত রসুলের পদচিহ্ন পৃষ্ঠদেশে আনিয়াছিলেন।

সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে প্রসব গৃহের চতুর্দ্দিকে স্বর্গীয় দূতগণে বেষ্টন করিয়া আনন্দ মনে দরুদ শরিফ পাঠ করিতেছেন।

জোনাব মৌলানা নুর মহাম্মদ বড়পীরের মৌলুদে গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহবুবে সোবহানী আব্দুল কাদের জেলানী যখন গিলান ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সে সময় জগতের তাপসিক সাধু পুরুষগণের ভাগ্যে শোবেমেয়ারাজ রজনী প্রকাশ পাইল এবং সে সময় সকল অলি আল্লাহ্‌গণই বড় পীরের সম্মান রাখিয়া, আপন আপন মস্তক হেঁট করিয়া দিল অর্থাৎ তাঁহার চরণ দুখানি স্কন্ধে রাখিবার জন্য একযোগে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

এস পীর দস্তগীর মহবুবে সোবহানী।
স্কন্ধে মোদের রাখ দিয়ে চরণ দুখানি॥

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, যেরজনীতে মহবুবে সোবহানী ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই পুণ্যাহ রজনীতে খাতেমলনাবিইন সাইয়েদল মোরসালিন শেষ নবি প্রেরিত পুরুষ, আপন সহচর ও আওলিয়াগণকে সঙ্গে লইয়া, সৈয়দ আবু সালেহের গৃহে আসিয়া

পদার্পণ করিলেন এবং আপন দলবল লইয়া, নিজ বংশধর বা গুণধর পিরান পীরের প্রতি দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন।

দরুদ।

ইয়ারাব্বে আয়জিনি মেন হোব্বে মাহবুবেকা।
ওা হাবলি মেন এস্‌কে মায়্‌শুকেকা।

রাবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আবু সালেহ্ এই দরুদ শরিফ শ্রবণ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তাহার পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন, হে আবুসালে! জগতে তুমিই ধন্য, তুমিই ভাগ্যবান; যে হেতু তোমার ঔরসে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বন্ধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি ঐ বালকের নাম রাখ, মহবুবে সোবহাণী অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু, পুনরায় শুনিতে পাইলেন, জগতে ইঁহার আব্দল কাদের নাম প্রচার হইবে, অর্থাৎ যথার্থ ইনি প্রভু ভক্ত বা বিশ্বপালক জগত কর্ত্তার প্রকৃত দাস হইবেন; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ঐ পবিত্র রত্ন গুণধর পুত্র বংশাবলী উজ্জ্বল করিয়া, জগতে মহান পূজ্যপদ লাভ করেন। আবু সালেহ্ এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, মহা হর্ষে হরষিত

হইয়া খোদাতায়ালার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং শোকরের দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া, পুত্রের মঙ্গল কামনা করিলেন। আমার হবিবে দোজাহান রসুলে করিম (সঃ) মহবুবে সোবহানির প্রতি যে, আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফজায়েল গওসিয়া নামক গ্রন্থের মধ্যে, এই হাদিস আলি করমুল্যা অজহু হইতে বর্ণিত আছে।

হাদিস।

কালা রসুলোল্লাহে (সঃ) আল্লাহোম্মারহাম খোলা-ফাএ আল্লাজিনা ইয়াতুনা মেনবায়দেইয়াল্লাজিনা ইয়ারউনা আ হাদিসে ওা সোনানি ওা ইউ আল্লেমু নাহান্নাসা।

অর্থ।

হজরত রসুল করিম (সঃ) বলিয়াছিলেন, হে বিশ্ব পালক খোদাতায়ালা (রহম) দয়া কর আমার প্রতি-নিধিত্ব (খলিফার) পর এবং যে আমার পরে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ধরাধামে আসিবেন, যে মহাত্মা আমার হাদিস বর্ণনা করিয়া, আমার তরিকা (পথ) ভালরূপে সকলকে শিক্ষা দিবেন।

জোনাব মৌলানা নুর মহাম্মদ সাহেব আপনার উর্দ্দু গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, যে তারিখে হজরত গওসল আজম জন্ম গ্রহণ করেন, ঐ সময়ে তাঁহার কৃপায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনার সঙ্ঘটন হয়। তাঁহার জন্ম ভূমি গিলান সহরে ঐ দিনে পুত্র সন্তান ব্যতীত কোন রমণী কন্যা প্রসব করেন না। কথিত আছে ঐ পবিত্র গিলান সহরে এগার শত রমণী গর্ভবতী ছিলেন, তৎ সমুদয় ভাগ্যবতী রমণী পিরান পীরের জন্ম-দিনে পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া আপনা আপনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। হজরতের সমবয়স্ক ১১ শত বালকগণ তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া, এককালের মধ্যে একবারে সকলেই মহা তপস্বী অলি আল্লাহ্ হইয়া-ছিলেন। হজরত গওসল আজম ভূমিষ্ঠ হইয়া বিশ্ব পালক খোদাতায়ালার প্রশংসা করিতেছিলেন, সে সময় যাঁহারা প্রসব গৃহে ফাতেমার সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালকের গোলাপসম দুই ওষ্ঠ আস্তে আস্তে হেলিতেছে, আর ঐ ওষ্ঠধর হইতে অদ্বিতীয় বিশ্ব পালকের নাম জপনা হইতেছে। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য ঈশ্বর সন্নিধানে মঙ্গল কামনা করিতেছেন কেবল একদৃষ্টে বিশ্ব পালক সৃষ্টি কর্ত্তার রচনা কৌশল দেখিতেছেন। যখন তিনি

স্থষ্টি কর্ত্তার দিকে নয়ন, মন, প্রাণ, কর্ণ যুগল একাগ্র চিত্তে রাখিয়া ছিলেন, সে সময় দয়াময় খোদাতায়ালা স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং স্বর্গ হইতে ফেরেস্তা স্বর্গীয় দূতদিগকে শান্তি বারি বর্ষণ করিতে, পবিত্র ভূমি গিলান সহরে পাঠাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে স্বর্গীয় দূতের আগমনে গিলান ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঘন ঘন দরুদ শরিফ পাঠ করিতে লাগিলেন।

দরুদ।

আল্লাহোম্মা সাল্লেআলা সৈয়েদেনা মহাম্মদি সৈয়েদেল মরসালিন। এরসাদে আওলাদেহি সেখ আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন কাদরী তবিকাতে আওালিন॥

বড়পীর সাহেবের শিশুকালের রোজা।

সেখ আবুসৈয়দ রহমাতুল্যা আলায়হে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গওসল আজম বড়পীর সাহেবের মাতা সাহেবাণী এরূপ বলিয়াছেন, আমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া সোবে সাদেকের পূর্ব্বে কেবল আমার দুগ্ধ পান করিয়াছিল, কিন্তু সোবে সাদেকের পর হইতে আর আমার

স্তনের দুগ্ধ পান করিলেন না। তাহার পরে বেলা অধিক হইতে কযেক জন প্রতিবাসী রমণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা সন্ধ্যার সময় রোমজানের চন্দ্র দেখিতে পাই নাই এখন আমরা রোজা (উপবাস) থাকিব কিনা? তখন আমি উঁাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা রোজা রাখিতে পার, কেননা আমার দুগ্ধের শিশু অদ্য রোজা বলিয়া স্তনের দুগ্ধ পান করেন নাই। ইনিও আজ ঈশ্বরের নিকটে (রোজা) উপবাস আছেন এবং তিনি সন্ধ্যার পরে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার প্রাণাধিক পুত্র দুগ্ধ পান করেন নাই, আর দুগ্ধ পান করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ চেষ্টাও পান না। কোন কোন লেখক বলিয়াছেন, গওসল আজম পিরান পীরের জন্ম রজনীতে আকাশে ঘোরতর মেঘ ছিল, এজন্য অনেকেই রোমজানের চন্দ্র দেখিতে পান নাই, সকলেই চন্দ্র দর্শনে নিরাশা হইয়া ছিল, তবে রোমজানের চন্দ্র নিশ্চয়ই উদয় হইবে বলিয়া সকলেরই মনে ধারণা ছিল কিন্তু সেই দেশে একজন প্রবীণ দরবেস সাধুপুরুষ বাস করিতেন, তিনি মনের সন্দেহ ঘুচাইবার জন্য ফাতেমা সাহেবাণীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবী আজ কি সাহাজাদা আপনার দুগ্ধ পান করিয়াছেন?

তখন তিনি বলিলেন, আজ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার দুগ্ধপুষ্য বালক কিছুই পান করেন নাই। ইহা শুনিয়া দরবেশ সন্তুষ্ট হৃদয়ে বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দেশে দেশে প্রচার হইয়া গেল যে, গিলান নগরের মধ্যে একটী সদ্য প্রসূত বালক রোজা রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বোগদাদ দেশের তপস্বীগণ মনে মনে ধারণা করিলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত মহিউদ্দিন রহমাতুল্যা আলায়হে প্রথম রোমজানে যে ভূমিষ্ঠ হইয়া রোজা রাখিয়াছিলেন, তাহা দুই চার দিবসের পরেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়া গেল। আজ জগতের ভণ্ড তপস্বীগণের রীতি নীতি দেখিয়া অবাক হইয়াছি? তাঁহারা কি বুঝিয়া যে, নামাজ, রোজা ত্যাগ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যিনি গুপ্ত তত্ত্বের (মারফতের) পরম গুরু তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াই রোজা রাখিলেন, আর ইঁহারা কি সকল পথ তয় করিয়া স্বর্গে উঠিলেন।

হজরত আব্‌দল কাদেরের প্রতি দৈববাণী।

দেখিতে দেখিতে চারশত ছিয়াত্তর সাল আসিয়া দেখা দিল, গওসল আজম আর মাতৃ-ক্রোড়ে সর্ব্বদা

শোভা পান না, পঞ্চমবৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, পাড়ায় পাড়ায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ান, কখন কখন আদর ক'রে মাকে মামা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকেন, কখন কখন ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ঘাটে খেলা করিয়া বেড়ান। একদিন পঞ্চ বৎসর বয়ক্রম কালে প্রতিবাসী বালকদের সহিত ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় একটী দৈববাণী স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন। কে যেন শব্দ করিয়া বলিতেছেন;—

উব্বিইয়া মোব'রেক। অর্থাৎ তুমি আ'মার দিকে শীঘ্র শীঘ্র এস মবারক। যে হেতু জগতে তোমাকে খেলা করিয়া বেড়াইবার জন্য পাঠাই নাই, তুমি আমার দিকে আগমন করিবে, আর অন্য লোকদিগকেও আমার দিকে আহ্বান করিবে, এবং পাপীকুল দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাকে এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছি; তুমি জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া পাপীগণকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া লইবে। আবার একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন;—

মিছে খেলায় মত্ত কেন হে প্রিয় বন্ধুজন।
এস এস, খেলা ছাড়ি বন্ধুকে কর স্মরণ॥

হজরত মহবুবে সোবহানী এই শব্দটী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,

কাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না কিন্তু চক্ষের পালট মারিতে না মারিতেই পুনর্ব্বার সেই শব্দটী শুনিতে পাইলেন, তখন ভয়ে ভীত হইয়া গৃহে পলায়ন করিলেন এবং মাতা সাহেবাণীকে ঐ শব্দের আদি বৃত্তান্ত সমুদয় কহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, বৎস! খুব সাবধান, নিশ্চয় জগতে তুমি একজন মহান তপস্বী বলিয়া এক সময়ে পরিচয় দিবে; তুমি যে শব্দ শ্রবণ করিয়াছ উহা জগত কর্ত্তা বিশ্বপালকের নিকট হইতে, আবার যখন শুনিতে পাইবে তখন অতি মনযোগের সহিত শ্রবণ করিও। একবার মহবুবে সোবহানির আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে রজনী যোগে নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে একজন স্বর্গীয় দূত স্বপ্নে আসিয়া কহিলেন, হে আব্দুল কাদের জিলানী! তুমি করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বপালক খোদাতায়ালাকে ভুলিয়া, নিদ্রাঘোরে পতিত আছ, উঠ! সেই প্রতিপালকের গুণ কীর্ত্তনে নিযুক্ত হও। তিনি এই মহা স্বপ্ন দর্শনে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং সকল চিন্তায় বিসর্জ্জন দিয়া, ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া মহাচিন্তায় নিযুক্ত হইলেন।

হজরত বড়পীরের বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাওয়া।

আগরা নিবাসী মৌলবী মহাম্মদ সাদেক আলী আপন গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছেন হজরত গওসল আজম রহমাতুল্যা আলায়হের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা একটী লোক সঙ্গে দিয়া গিলান সহরের মাদ্রাসায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে দিলেন। হজরতের সঙ্গে পথি মধ্যে মানবাকারে একটী স্বর্গীয় ফেরেস্তা আসিয়া সঙ্গী হইলেন এবং বড়পীর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। মকতবে আসিয়া দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিকে বালকের সমাগমে বিদ্যালয় পরিপূর্ণ, এমন স্থানের অসঙ্কুলান হইয়াছে যে, একটী বালক আসিয়া যে বসিবে, তাহারও উপায় নাই, তখন নিরূপায় হইয়া ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূত কহিলেন, তোমরা একটু স্থান দাও এই বালকটী বসিবেন। তাহাতে কোন লোকই সড়িল না, এমন সময় দৈববাণী হইল, "উঠ, স্থান ছাড়িয়া দাও ;—আল্লার—অলি আসিয়াছেন, তিনি বসিবেন, আর কাল বিলম্ব করিও না ; তাঁহাকে বসিতে স্থান দাও।" দৈববাণী শুনিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়, আশ্চর্য্য বোধ করিতে

লাগিলেন, বালকেরা তাড়াতাড়ি করিয়া সারগা পড়িল, হুজরত গওসে পাক খোদাকে স্মরণ করিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। পরে শিক্ষক মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন, পুনরায় বলিলেন, পড় "বিসমিল্লাহ্ হের্‌রাহামা নের্‌রাহিম।" শিক্ষকের শিক্ষা পাইয়া তখন তিনি, আউজবিল্লা ও বিসমিল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া পবিত্র কোরাণ শরিফের আলিফ, লাম, মিম শব্দ সহ পঞ্চদশ পারা কোরাণ শরিফ পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। পুনর্ব্বার বলিলেন, "থামিয়া রহিলে কেন; আর বার পঞ্চদশ পারা পাঠ কর" পিরাণ পীর গওসল আজম কহিলেন, "আর আমি জানিনা, এই পর্য্যন্ত আমি মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া শিক্ষা করিয়াছি।" ওস্তাদ কহিলেন, "ভাল! আর কেন শিক্ষা কর নাই?" তিনি কহিলেন, "মাতা আমার পঞ্চদশ পারার হাফেজ ছিলেন, এই পঞ্চদশ পারা পর্য্যন্ত পড়িতেন, আর বেশী তিনি পাঠ করেন না, তজ্জন্য আমিও শিক্ষা পাই নাই।

হুজরত বড়পীর সাহেব মাতাকে আলোক দানে সাহায্য করেন।

আনিসেল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সৈয়দ

আব্দোল জব্বার হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন হজরত বড়পীর সাহেবের মাতা ফাতেমা সাহেবাণী অন্ধকার রাত্রিতে কোথায় গমনাগমন করিতেন; তখন অকস্মাৎ একটী আলোক আসিয়া পেত্নীর ন্যায় জ্বলিতে থাকিত। ফাতেমা তাহাতেই অতি আনন্দলাভ করিতেন। কেননা অন্ধকারে আলোকের সাহায্য হইতেছে। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে কোন কার্য্য বশতঃ যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি একটী প্রজ্বলিত আলোক জ্বলিতে জ্বলিতে সঙ্গে চলিল; হঠাৎ সেই স্থানে বড়পীর সাহেব যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি সেই আলোকটী নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ফাতেমা কহিলেন, "বৎস আব্দোল কাদের! তুমি আসা মাত্রেই আমার সম্মুখের আলোকটী নির্ব্বাণ হইয়া গেল কেন?" তখন তিনি বলিলেন, "মাতঃ! ওটী একটি উপ আলোক মাত্র সয়তান 'পেত্নী; আমি উহাকে দুর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। উহার পরিবর্ত্তে তোমার সাহায্যে একটী খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক দৈব আলোক নুর জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছি, আপনি যখন অন্ধকারে কোথাও গমনাগমন করিবেন, তখনই দৈব আলোকে আলোকিত করিয়া সকল সময় সাহায্য করিবেন। এ কথা গিলান নগরে প্রচার আছে যে,

সেই দিন হইতে ফাতেমাদেবী অন্ধকারে যখনই যেথা যাইতেন সেখানেই দৈব আলোক প্রাপ্ত হইয়া অবাধে সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। এমন কি সেই আলোকে সমস্ত গৃহদ্বার আলোকিত হইয়া পড়িত, আর অন্য প্রদীপের আলোকের আবশ্যক হইত না।

বড়পীর সাহেবের বোগদাদ গমন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হজরত বড়পীর সাহেব, নিজের জমিতে চাষ চষিবার জন্য গরু হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে ছিলেন এবং সময়ে গরুকে যষ্ঠীর দ্বারা তাড়না করিয়া ভূমির দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাহাতে সেই বৃষটী পীরসাহেবের তাড়নায় বিরক্ত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া কহিল, হে আব্দল কাদের। "মালেহাজা খোলেক্‌তা ওামা বেহাজা উমরেতা।" অর্থাৎ তুমি এই কার্য্যের জন্য জন্ম গ্রহণ করনাই, আর তোমাকে এই সকল কার্য্যের আদেশ করিতে ঈশ্বর তোমাকে জগতে পাঠান নাই। তিনি চতুষ্পদ জন্তুর নিকট এই উপদেশটী প্রাপ্ত হইয়া তখনই আপনার গৃহের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া অট্টালিকার উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে,

আরফাতের প্রান্তরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, সে সকল লোক হস্ত তুলিয়া বিশ্ব পালকের নিকট মঙ্গল কামনা করিতেছেন (১)। আরফাত প্রান্তরের হাজিগণের এই মহান দৃশ্য দর্শন করিয়া হজরত পিরান পীরের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন হইল। তখনই নিম্নে আসিয়া করজোড়ে বিনয় বচনে মাতৃ সন্নিধানে নিবেদন করিলেন যে, "মাত! আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুপ্রসন্ন মনে বিদায় দিন, আমি বিদ্যা শিক্ষা হেতু বোগদাদ রাজ্যে গমন করিব; সেই বোগদাদ নগরের মহ মহা সাধু সংসর্গ লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। তৎপরে প্রান্তরের আদি বৃত্তান্ত একে একে মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া দিলেন তখন মাতা সাহেবাণী পুত্রের বিদেশ যাত্রার জন্য নিজের হস্তে একখানি পিরহান সেলাই করিয়া সেই পিরহানের ভিতরে চল্লিশটী দিনার যত্নের সহিত সেলাই করিয়া দিলেন, কেননা কখন কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত হইলে গুপ্ত মুদ্রা দ্বারা বিপদে রক্ষা হইতে পারিবে তাহার পরদিন একদল বণিক আসিয়া উপস্থিত হইল, হজরত বড়পীর তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বোগদাদ গমন করিতে মাতার নিকট বিদায়

(১) আরফাত, মুসলমান দিগের হজ্জব্রতের পুণ্য ভূমি।

চাহিলেন। মাতা কহিলেন, ' যাও বৎস . তোমার রক্ষক সেই কৃপাময় বিশ্ব পালক জগৎ কর্ত্তা, তিনি তোমাকে সর্ব্বাস্থানে সকল সময়ে রক্ষা করিবেন, বিপদে পড়িলে তাঁহারই শরণাগত হইও, কথনই তাহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যের আশ্রয়ের প্রার্থী হইও না ; ইহাও দেখিয়া থাকিবে ; মাতা দুগ্ধপোষ্য বালককে যতই কেননা প্রহার করে, তথাপি বালক অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়ের ক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্য লালাইত হয়। তথন সেই পুত্র বৎসলা জননী বালককে ক্রোড়ে লইয়া সোহাগভরে, তাহার চাঁদমুখে লক্ষং চুম্বন প্রদান করিতে থাকে,। ঈশ্বরও তোমাদের প্রতি সেইরূপ দয়াবান, মানব যথন বিপদে পতিত হইয়া অন্যের আশ্রয় অন্বেষন করেনা, তথন তিনিই দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, যেমন ভীষণ সঙ্কটে অগ্নি হইতে এব্রাহিমকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে হেতু আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার পবিত্র কোরাণ শরিফের স্থরা আম্বিয়াব পাঁচ রুকুর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েত।

"কোলনা ইয়া নারনকুনি বারদাঁওওাসালামান
আলা এব্রাহিমা।"

অর্থ।

খোদাতায়ালা বলিলেন, "হে অগ্নি, তুমি এব্রাহিমের উপরে শীতল ও শান্ত হও।" অর্থাৎ জ্বলন্ত হুতাশনে এব্রহিম আলায়হেচ্ছাল্লামকে সেই অগ্নি হইতে তাঁহার জন্য মনোহর পুষ্পোদান করিয়া দিয়া খোদাতায়ালাই রক্ষা করিয়াছিলেন। সাবধান তুমি খোদাতায়ালার সাহায্য ব্যতীত অন্যের সাহায্যের প্রার্থী হইও না। আর একটী কথা স্মরণ রাখিও, তোমার জামার বগলের নিম্নে চল্লিশটী দিনার সেলাই করিয়া দিয়াছি ? কখন বিপদে পড়িলে ইহার জন্য মিথ্যা বলিও না ; যে হেতু তুমি মিথ্যা বলিলে খোদাতায়ালার নিকট গোপন করিতে পারিবে না এবং সত্য কথার মার নাই, কিন্তু অসত্যের শতেক দোষ।" হজরত গওসল আজম মাতৃ আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার পাইয়া বণিকদলে মিলিত হইলেন, তাঁহারা হজরতকে সঙ্গে লইয়া বোগদাদের দিকে গমন করিল, দুই একদিনের পরে একটী প্রান্তর

মধ্যে সকলে তাঁবু ফেলিয়া (শিবির স্থাপন করিয়া) রহিল, বণিকদল পথ চলার পরিশ্রমে আহারের পরে যে যাহার তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া বণিক-দিগকে আক্রমণ করিল। বণিকদল নিদ্রা ভঙ্গে দস্যুর ভীষণাঘাতে কেহ২ প্রাণত্যাগ করিল, কেহ আহত হইয়া বন জঙ্গলে পলায়ন করিল, দস্যুগণ বণিকদের মাল আসবাব সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইল। হজরত পীর সাহেব দস্যুগণের অত্যাচার দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিক-বৎ নির্ব্বাক হইয়া সেই প্রান্তর মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একজন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ দস্যু আসিয়া কহিল, রে বালক। তোমার সঙ্গে কিছু আছে? তাহার সেই করালবদন বিকট-মূর্ত্তি ও কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না বরং অকুত সাহসে বলিলেন, হাঁ আছে বৈকি? উত্তর হইল কি আছে? কহিলেন, চল্লিশটী দিনার আছে। পুনঃ উত্তর হইল, কৈ কোথায় আছে? তখনই বলিলেন, এই আমার পিরহানের সঙ্গে সেলাই করা বগলের নীচে আছে। বালকের কথায় দস্যু ঠাট্টা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় জন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও সেইরূপ

উত্তর করিলেন, উভয়ে তাহারা আপন সর্দ্দারের নিকট যাইয়া, সমস্ত বিষয় অবগত করাইলে, সর্দ্দার তখনই বালককে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ তোমার নিকট কি আছে? তিনি নির্ভয় চিত্তে কহিলেন, চল্লিশটী দিনার আমার বগলের নীচে আছে, সর্দ্দার তখনই পিরহান খুলিয়া দিনার কয়টী বাহির করিয়া কহিতে লাগিল, হে বালক! তুমি আমাদিগকে দেখিয়াও কি সাহসে নির্ভয় চিত্তে দাঁড়াইয়া আছ, আমাদের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার একটু কি ভয় হইল না; আমরা তোমার সম্মুখে কতশত জনকে মারিয়া ফেলিলাম, তথাপি তোমার গুপ্ত মুদ্রা গোপন না করিয়া, আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিলে যে? "হজরত বলিলেন, একা জগত পালক শাসনকর্ত্তা ব্যতীত কাহাকে কখন ভয় করি নাই এবং করিব না, অসত্য কাহার নিকট কখনও বলি নাই এবং কখনও বলিব না, এই বলিয়া এই বয়েতটী পাঠ করিলেন;—

বয়েত।

রাস্তি মুজবে রেজাই খোদাস্ত।
কেস নাদায়েম কে গম শদাজ রাহেরাস্ত॥

অর্থ।

সত্য কথা কহি যবে সন্তোষ খোদায়।
সত্যপথে কভু নাহি কেহ ভয় পায়॥

বড়পীর সাহেব দস্যুগণকে মুরিদ করিবার বিবরণ।

ডাকাত সর্দ্দার একদৃষ্টে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বাক্যাবলি শুনিতেছিল, বালকও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে দস্যুদলপতি। আমি আসিবার কালে আমার মাতার নিকট সত্য করিয়াছিলাম যে, কখনই সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না এবং তোমার সহিত যে সত্য করিলাম এ সত্য কখনই ভঙ্গ করিব না, তবে কেমন করিয়া সত্য ভঙ্গ করিয়া মিথ্যা বলিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইব এবং ভবধামে আসিয়া দুই চারি দিবসের জন্য মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিব। দস্যুপতি বালকের মুখে এই সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরকালের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লাহু আকবার বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সোবহানাল্লা এই বালকটী

আপনার মাতার ওয়াদা সত্য পালনে বাধ্য; আর আমি আমার প্রতিপালক জগত পিতার আদেশ ত্যাগ করিয়া পাপকর্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়া দিলাম, হায় আমার মত মহাপাপী জগতে আবত কেহই নাই; এই বলিয়া সঙ্গি দস্যাদিগকে বলিল, আর আমার পরধনে আকাঙ্ক্ষা নাই, তোমরা সকলই গ্রহণ কর; এখন আমি পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, এই বালককে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া, গুপ্ত তত্ত্ব অবগত হই। এই বলিয়া দস্যুপতি বালকের হস্তে (মুরিদ) অনুস্মরণ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সর্দ্দারের দেখাদেখি দস্যুগণও মুরিদ হইয়া বণিক দলের সকল মাল আসবাব ফিরাইয়া দিল, খোদাতায়ালার কৃপায় বড়পীরের অঙ্গস্পর্শে ষাটজন দস্যু সকলেই মহা তপস্বী সাধু পুরুষ হইয়া গেল। কিন্তু বড়পীর সাহেবের পীর (গুরু) সৈয়দ আবু সখজুনি ছিলেন।

মহিউদ্দিন নামের ব্যাখ্যা।

সেখ আব্দুল হক মহদ্দস্ দহলবী রহমাতুল্যা আলায়হে আখবারল আখিয়ার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হজরত বড়পীর সাহেব যে সময় দস্যুদিগকে মুরিদ করিয়া, একাকীই

বোগদাদ নগরের দিকে চলিলেন, সেই সময় দাতা দয়ালু খোদাতায়ালা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এস্‌লাম ধর্ম্মকে মনুষ্যরূপে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যে পথ দিয়া বোগদাদ নগরে যাইতে ছিলেন, দেখিলেন সেই পথিমধ্যে একটী লোক ক্ষীণ জীর্ণ জরা-জীর্ণাবস্থায় হীনবল হইয়া পড়িয়াছে; সেই লোকটী পীরসাহেবকে দেখিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, হে মহবুবে সোবহানি! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া উঠাও, আমি অত্যন্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। ইহা শুনিয়া দয়াদ্র হৃদয় মহবুবে সোবহানি হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। যখন হজরত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন তখনই সেই হীনবল ক্ষীণ-জীর্ণ পুরুষটী নববলে বলিয়ান হইয়া, মহাবলবন্ত ও জ্যোতির্ম্ময়রূপে তেজপুঞ্জ শক্তিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, যেমন তুমি আজ আমাকে নববলে বলিয়ান করিয়া পূর্ণশক্তি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়াছ, তেমন তুমি আমার নিকট হইতে মহা গৌরব সূচক মহিউদ্দিন নাম প্রাপ্ত হইলে। আজ হইতে জগতে তোমার মহিউদ্দিন নাম ঘোষণা হইতে থাকিবে হে পবিত্র পুরুষ! আমি কে তাহা তুমি বুঝিতে বা জানিতে পার নাই? আমি দিন এস্‌লাম; এই বলিয়া দিন এস্‌লাম বড়পীরের অদৃশ্য

হইয়া গেলেন। হজরত তথা হইতে বোগদাদের মাদ্রাসায় আসিয়া ওস্তাদের কাছে নানা প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। হজরত সামান্য দিনের মধ্যেই হাদিস, ফেকা, তফসির পড়িয়া বিদ্যায় মহা পণ্ডিত হইয়া ছিলেন। তিনি যে বিদ্যায় মহা বিদ্বান হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই কৃত আরবী পদ্যটী পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আরবী কেসিদাহ্।

দারাস্তল এলমা হাত্তা ছের্‌তো
কোল ইয়াও ওয়ানেল কোছ্ ছায়াদা
মেম্ মাওলাল মাওয়ালি।

অর্থ।

এত বিদ্যা শিক্ষা আমি করিনু জগতে।
নিশ্চয় কোতব আমি হইনু তাহাতে॥
মহাপুণ্যবান যবে হইনু ধরায়।
লভিলাম গুপ্ত বিদ্যা ঈশ্বর কৃপায়॥

হজরত আবুহেবেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুল মকবুল (সঃ) মহবুবে,সোবহানি (রঃ) বিদ্যার প্রশংসা

করিবার কালে, এই বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "কালু ওয়ামাল মোফররাদুনা" এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতে, কোন সহচর হজরত রসুলে করিম (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে প্রেরিত পুরুষ! মোফররদ্দিন কাহাকে বলে, তিনি বলিলেন, মোফররদ্দিন ঐ লোক যিনি সদা সর্ব্বদা খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। এজন্য হজরত বড়পীর সাহেব মোফররদ্দিন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মজমুয়ে ফজায়েল গ্রন্থের মধ্যে লিখিত আছে যে, সেখ ওসমান বোগদাদি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; যে সময় হজরত আব্দুল কাদের জিলানি (রঃ) বোগদাদ সহরের বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া ছয়শত ছাত্রদিগকে তছুয়েফ বা মারফত বিদ্যা ও ফেকা, হাদিস, তফসির শিক্ষা দিতেন, সে সময় কি মনোহর দৃশ্য দেখা যাইত। যে ছাত্রদের পড়িবার কেতাব না থাকিত তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং নিজের হস্তে হাদিস, ফেকা, তফছির ইত্যাদি লিখিয়া দিতেন।

কেরামতি কোরাণ।

জোব্দাতল আবরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবুল মজফুরের পুত্র মোবারেক তিনি হেকমত

বা ভোজবিদ্যায় মহা পারদর্শী ছিলেন, তিনি যেখানে সেখানে মেজিক বা ভোজবিদ্যা দেখাইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি হেকমতের কেতাব খানি সঙ্গে লইয়া হজরত পিরান পীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, মোবারেক! তোমার সঙ্গে যে হেকমতের কেতাব খানি আছে উহা তোমার অতি আদরের সামগ্রী নয়? তুমি ঐ পুস্তকটী জলে ধৌত করিয়া লইয়া আইস, নিশ্চয় জানিবে ঐ পুস্তকের বিদ্যা শিক্ষা করা মুসলমান দিগের নীতি বিরুদ্ধ। হজরতের কথায় লজ্জিত হইয়া মোবারেক বড়ই ভাবনা চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় আমার সাধের কেতাব কেমন করিয়া জলে ধুইয়া ফেলিব! কত চেষ্টা করিয়া এই পুস্তকটী পাইয়াছিলাম, আবার ইহা নষ্ট করিয়া দিলে কোথায় বা পাইব। হজরত তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আরক্ত লোচনে কর্কশস্বরে কহিলেন, মোবারেক! তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, নতুবা হাতের কেতাব দূরে নিক্ষেপ কর, নচেৎ তোমার গৃহে রাখিয়া এস, আর উহা কখনই আমার সম্মুখে লইয়া এস না। মোবারেক বড় পীরের কোপদৃষ্টে পতিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাত পা অবশ হইয়া পড়িল,

মস্তক হেঁট করিয়া অধোমুখে কতই কি চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভু! ক্ষমা করুন, আর আমি পুস্তকের মায়া করিব না।" তখন দয়ার সাগর সংগুলে সোবহানি, বলিলেন, "দাও তোমার পুস্তটী আমার হাতে দাও।" মোবারেক পুস্তকটী দিবার সময় একবার খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে একটীমাত্রও অক্ষর নাই, সকল পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অক্ষর শূন্য হইয়া সমস্ত পুস্তকটী শুভ্রবর্ণ হইয়াছে; তখন তিনি বিস্ময়পূর্ণ হইয়া তাহা বড়পীরের হস্তে অর্পণ করিলেন। হজরত ঐ পুস্তকটী হস্তে লইয়া, তাহার সমুদয় পৃষ্ঠা একে একে উল্টাইয়া দেখিলেন, পরে মোবারেককে দিয়া বলিলেন, উহা কি উত্তম গ্রন্থ যাহা পাঠ করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া যায়, ধর গ্রন্থ, পবিত্র হইয়া ধর? মোবারেক তৎক্ষণাৎ অজু করিয়া সমাদরের সহিত হজরতের হাত হইতে লইয়া প্রথম খুলিয়া দেখিলেন যে, ইহা মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরাণ শরিফ এবং সমস্তই অনুবাদ করা তফছির। এই কেরামতি কোবাং দর্শন করিয়া মোবারেক পীরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, হজরত তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "মোবারেক! তুমি ঐ ভোজবিদ্যা যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা একবারেই ভুলিয়া যাও এবং পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য সরল অন্তরে তওবা কর। তিনি

তখনই পীরের হস্তে হাত দিয় কৃত পাপ বিমোচনের জন্য সরল অন্তরে তওবা করিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শিক্ষিত ভোজবিদ্যা সমুদয় লোপ পাইয়া গেল। সেই ব্যক্তি ও বড়পীরের হস্তে হস্ত দিয়া জগতের মধ্যে সাধু হইয়া ঈশ্বর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

হজরত বড়পীরের ওয়াজ বা বক্তৃতার বিবরণ।

মহাত্মা আব্দল কাদের জিলানি তাঁপসকুল চূড়ামণি দয়াময় খোদাতায়ালার ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ সমূহ কায়মনোবাক্যে ও প্রাণপণ যত্নে পালন করিতেন। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা ছিল। ইঁনি সময়ে সময়ে নিভৃত অরণ্যে মানব চক্ষের অন্তরালে লুক্কাইত থাকিয়া তন্ময় চিত্তে বিশ্ব পালক সৃষ্টি কর্ত্তার আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। কখন কখন উপদেশ দিবার জন্য নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে, পল্লিতে পল্লিতে, মসজিদে মসজিদে, বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার সুমধুর উপদেশ বাক্যে শত শত পাপী পাপ পথ ত্যাগ করিয়া এস্লাম ধর্ম্মের আশ্রয়

গ্রহণ করিত, শ্রোতাগণ একদৃষ্টে হজরতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; এমন কি শ্রোতাগণ নিবব নিঃশব্দে নির্ব্বাক হইয়া একাগ্র চত্তে ওয়াজ শুনিয়া নিজের জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। তাঁহার বক্তৃতার কি মোহিনী শক্তি ছিল তাহ কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

কেসিদা।

জেস্‌তরফ করতে থে ওহ্ নেগাহ্।
মোম হোতা থা সঙ্গ দেল ওয়ালাহ্॥

অর্থ।

যেদিকে ফিরেন তিনি চাহিয়া দেখিত।
পাষাণ হৃদয় যাদেব কোমল হইত।

তিনি বড় বড় সভাসমিতিতে এইভাবে ওয়াজ নছিহতে উপদেশ করিতেন যে, হে মসলেম ভ্রাতৃগণ! ' তোমরা মন্দ বা দুষ্ট লোককে কখনও আশ্রয় দিও না, মন্দ বাসনা পূর্ণ না হইলে তজ্জন্য দুঃখিত বা বিরক্ত হইও না; সচ্চরিত্র ও সৎলোককে কখনও কষ্ট দিওনা; অতি

আবশ্যক ও অভাব হইলেও কাহার নিকট যাচ্ঞা করিও না; পরকাল প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা সাধু লোকের সঙ্গ লইও; যে সকল দরিদ্র লোক দান পাইবার উপযুক্ত, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে দান করিও, জ্ঞানবান ও বিদ্যান্ লোকদিগকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিও; ধর্ম্মবহির্ভূত কথার প্রতি মনোযোগ দিওনা; যাঁহারা ঈশ্বর প্রেমিক সাধুলোক তাঁহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিওনা; যে সকল জ্ঞানী ও সাধু লোকের দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সকল উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, নিজের ক্ষতি বোধ হইলেও এরূপ লোকদিগের সঙ্গ ছাড়া হইও না। এইরূপ নানা উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া কত শত পাষাণ হৃদয় ও মুর্খ লোকদিগকেও সৎপথে আনয়ন করিয়া ছিলেন।

বক্তৃতার সভায় একটী স্ত্রীলোকের অদৃশ্য রুমাল।

সেফাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন হজরত বড়পীর সাহেব তেজঃপুঞ্জ শরীরে এস্কে এলাহীতে নিমগ্ন হইয়া ওয়াজ বক্তৃতা করিতে ছিলেন, হঠাৎ হজরতের মস্তক হইতে পাগড়ীটী

খুলিয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া সভাস্থিত শ্রোতাগণ, সকলেই নিজের নিজের মস্তক হইতে পাগ্ড়ী ও টুপী যে যাহার খুলিয়া পীরান পীরের পাগ্ড়ীর সঙ্গে একত্রে রাখিয়া দিল; পরে যখন ওয়াজ নছিহত বন্ধ হইয়া গেল, তখন হজরত আপনার পাগ্ড়ীটী লইয়া সভাস্থিত সকলকে, নিজ নিজ পাগ্ড়ী ও টুপী তুলিয়া লইতে বলি-লেন। পীর সাহেবের আদেশে তথনই যাহার যে পাগ্ড়ী ও টুপী তাহা তুলিয়া লইলেন। সকলে আপন আপন পাগ্ড়ী ও টুপী লইবার পরে দেখিলেন যে, সেস্থানে বেশীরভাগ একটী স্ত্রীলোকের মস্তক ঢাকা রুমাল পড়িয়া আছে, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এ সভায়তো কোন স্ত্রীলোকের আগমন নাই—তবে এ রুমালটী কোথা হইতে আসিল, এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে সেই রুমালটী সকলের নয়নগোচর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল; তখন সভাস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেখ আবুওল কায়েম রহমাতুল্যা আলায়হে হজরতের নিকটে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহাত্মন! ঐ রুমালটী কাহার এবং উহা কোথায় চলিয়া গেল?" তিনি কহিলেন, "এই পল্লীর মধ্যস্থিত বাটীর একজন মহা তপস্বিনী স্ত্রীলোক অন্দর মহল হইতে আমার ওয়াজ শ্রবণ করিতেছিলেন,

যখন তোমরা মস্তক হইতে নিজ নিজ টুপী ও পাগ্‌ড়ী খুলিয়া রাখিলে সে সময় ঐ গৃহবাসিনী তপস্বিনী রমণী আমার সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তকের রুমাল খুলিয়া এখানে রাখিয়াছিলেন, সেই রুমালটী এখন অদৃশ্য হইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া গিয়াছে। আর একদিন তিনি অগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ শরীরে ধাতৃ গৃহে ওয়াজ করিতেছিলেন, তাঁহার সেই অগ্নিবৎ তেজঃপুঞ্জ শরীরের তেজঃ গৃহস্থিত জ্বলন্ত প্রদীপ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘূর্ণিত বায়ুর মত চতুর্দ্দিকে ঘূরিতে লাগিল। ওয়াজ বন্ধ হইবার পরে সেই জ্বলন্ত প্রদীপ স্থির ভাবে বসিয়া গেল। ধাতৃ গুণবতী প্রদীপের আশ্চর্য্যভাব দর্শন করিয়া হজরতকে আদি বৃত্তান্ত অবগত করাইল। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে ধাতৃমাতা! আমার অগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ শরীরের (জালালি ফায়েজ) জ্বলন্ত *প্রদীপ কখনই সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া, প্রদীপটী স্থির থাকিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে ঘূরিয়াছিল।

দরুদ সালাম।

অস্‌সালম আলায়কা ইয়ামারুফো।
আস্‌সালাম আলায়কা ইয় গওসে পাককো॥

আস্‌সালাম আয় সাইদে ওাসওলালি।
আস্‌সালাম আয় সাইদে ওাজ্জিলানি॥

বড়পীর সাহেব স্বপ্নে হজরত আয়সা সিদ্দিকার স্তনদুগ্ধ পান করার বিবরণ।

জওাহেরল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত এব্‌নে এসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হজরত গওসে সাকলায়েন পিরান পীর রহমাতুল্যা আলায়হে বলিলেন, আমি এক সময়ে রাত্রিকালে নিদ্রাবশতঃ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম যে, আকাশ হইতে কয়েক জন স্বর্গীয় দূত আসিয়া, আমাকে শূন্যে উঠাইয়া মদিনা সরিফে হজরত আয়েসা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহু আনহার পার্শ্বে রাখিয়া তাঁহারা কে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাজিঃ) আমাকে অতি যত্নে ও স্নেহের সহিত আদর করিয়া, নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া হৃদয় মধ্যে ধারণ করিলেন, যখন তিনি বাৎসল্যভাবে সস্নেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার পবিত্র স্তন দুইটী হইতে প্রবলবেগে নদীর স্রোতের ন্যায় দুগ্ধ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমি সেই সুধাতুল্য পবিত্র

স্তন দুগ্ধ পান করিয়া উদর পরিপূর্ণ করিলাম। সেই সুধাসম দুগ্ধ পান করিয়া, প্রাণ সুশীতল হইল, হৃদয়ে শান্তি আসিল, দৈব বলে সর্ব্ব শরীর বলিষ্ঠ হইল এবং প্রত্যেক লোমকুপে গুপ্ত মারফত বিদ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্বর্গের সুশীতল সমীরণে হৃদয় যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, এমন সময় সরওয়ারে আম্বিয়া খাতেমল মোরসালিন নবি দোজাহান আসিয়া, হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাজিঃ) কে বলিলেন ;—

ইয়া আয়েসাতা লেহাজা ওলাদোনা ওাকোর্‌াতো অয়ইউনেনা ওাজিহান ফিদ্দুনিয়া ওাল আখেরাতে ;

অর্থ।

হে আয়েসা। ইনি তোমারই বংশধর সন্তান, ইহকালের ও পরকালের জন্য।

বড়পীর সাহেব হজরত রসুলকে স্বপ্নে দর্শন করেন।

তালখিয়েছ কালাদ নামক গ্রন্থে সেখ আবু জেকরিয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত গওস পাক পিরান পীর (রঃ) বলিলেন, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম

যে, হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) একটী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, শূন্যমার্গে আমার গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন ধরণীতলে রাখিয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে উজ্জ্বলবস্ত্র বংশধর চূড়ামণি নুরল আইন। (জ্যোতির্ম্ময় দর্পণ) আমার নিকটে শীঘ্র আইস। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই তাঁহার পার্শ্বে সালাম করিয়া দাড়াইলাম। দয়ার সাগর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়া নিজের পার্শ্বে সিংহাসনে বসাইয়া, অতি স্নেহে আমার ললাট দেশে চুম্বন প্রদান করিলেন। তৎপরে আপনার পবিত্র অঙ্গ হইতে, পরিধান করা পিরহানটী খুলিয়া স্বহস্তে আমার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন ;—

হাজা খালয়াতোল গাওসিইয়েতে
আলাল কোতাবে।"

অর্থ।

তোমাকে প্রতিনিধি বাদশাহী পদ দান করিয়া মহা আদেশ দাতা বা সহর রক্ষাকর্ত্তা করিয়া দিলাম।

শূন্যে ভ্রমণকারী এক সাধু পুরুষের শাস্তি।

জোওাহারাল আসুরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,

আবুওাল গানায়েম (রঃ) বলিয়াছেন যে, একদিন আমি হজরত্ত মহিউদ্দীন বড়পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম, দেখিলাম হজরত যে বৃক্ষতলায় সদা সর্ব্বদা আসিয়া বসিতেন, সেই বৃক্ষমূলে একটী অর্দ্ধবয়সী লোক ধূলায় শুইয়া যেন শয্যাগত রুগীর মত হাত পা আছড়াইয়া ছটফট করিতেছেন। স্বচক্ষে তাঁহার সে দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখনই তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, হে শয্যাগত্ত পথিক! আপনি কি জন্য এই বৃক্ষ তলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন? আপনার কি হ'য়েছে বলুন, সাধ্য থাকে উপকার করিতে চেষ্টা করিব। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি হজরত মহবুবে সোবহানী আব্দুল কাদের জিলানির নিকট মহা 'অপরাধ করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া, আমার কৃত পাপের বিমোচনের জন্য হজরতের নিকট প্রার্থনা করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি করিয়া দিতে পারেন কি? আমি সেই অপরিচিত পথিকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বড়পীরের নিকট আসিয়া সেই পথিকের সমুদয় দুর্দ্দশার কথা বলিয়া, তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া করুণস্বরে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, হুজুর! অধম তারণ

পতিত পাবন! দয়া করিয়া সেই মহাপাপী নির্ব্বোধ পথিকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া এ দাসের প্রার্থনা রক্ষা করুন। তখন দয়ার আধার পিরান-পীর কহিলেন, ভাল! তোমার কথা রক্ষা করিয়া ওরূপ মহা অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু তাহাকে সাবধান করিয়া দিও, দ্বিতীয়বার যেন এমন অন্যায় কার্য্য আর না করে, আবার যদি তাহাকে এরূপ হিংসাতুর কার্য্য করিতে দেখি। ইহা হইতেও অধিক শাস্তি প্রদান করিব। আমি হজরতের নিকট বিদায় হইয়া সেই পথিককে সমুদয় কথাই অবগত করাইলাম, সে সমুদয় কথা স্বীকার পাইয়া, তখনই উঠিয়া শূন্যে উধাও হইয়া উড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে আমার দৃশ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। পুনরায় আমি হজরত পিরান-পীরের নিকটে আসিয়া বলিলাম, হুজুর! উনি কে? এবং আপনার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়া ছিলেন যে, আপনি তজ্জন্য উহাকে শাস্তি না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। আমি দেখিলাম যে, উহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, কেননা দেখিতে দেখিতে শূন্যমার্গে উধাও হইয়া উড়িয়া গেল। তবে কি উনি দানব না দৈত্য! সেই কথা আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই আন্দোলন হইতেছে, আপনি ইহার আদি বৃত্তান্ত বলিয়া আমার মনের কৌতুহল নিবারণ করুন। তখন তিনি

বলিলেন, ঐ ব্যক্তি আওলিয়ায়ে মোরদানে, মহা তপস্বী। আপনার সাধনাবলে, বাতাসে ভর করিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যেখানে সেখানে গমনাগমন করে। একদিন বায়ুভরে শূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার সহরে যখন আসিয়া পৌঁছিল, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলিল যে, এই সহরে আমার মত উপযুক্ত এমন কোন মহান্ বোজর্গ সাধু পুরুষ নাই যে তাঁহার জন্য নিম্নে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যাইব ; এই আত্ম গরিমার দোষেই আমার নিকট তাহাকে শাস্তি পাইতে হইল, যখন আমি উঁহার ঐ অলৌকিক মহাবিদ্যা বেলায়েত কাড়িয়া লইলাম, তখন ঐ তপস্বী নিরুপায় হইয়া বৃক্ষমূলে পড়িয়াছিল। যদি না তুমি উঁহার সাহায্যে আমার নিকটে আগমন করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ মদগর্ব্বিত তপস্বী ঐ বৃক্ষতলে হাত পা আছড়াইতে আছড়াইতেই প্রাণ ত্যাগ করিত।

বড়পীর সাহেবের অলিআল্লাহ্ হইবার নিদর্শন।

সোলতানোল আজকার নামক গ্রন্থে মৌলানা শাহ্ মহাম্মদ এলমাল একিন খোলফায়ে রাসেদিন লিখিয়াছেন

যে, একদিন বোগদাদের কোন কোন লোক হজরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে সময় হইতে অলি বা সাধু হইয়াছেন, তাহা কোন সময়ে টের পাইয়া ছিলেন। হজরত পীরসাহেব কহিলেন, যে সময় আমি বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতাম, সেই সময় দেখিতে পাইতাম স্বর্গীয় দূতগণ আমার রক্ষক প্রহরী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন, আবার বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে পরেই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেন, হে বালকগণ। তোমরা উঠ—সম্মান কর, আমার সঙ্গে খোদাপ্রাপ্তি মহাপূজ্যবান লোক আছে, তাহাতে বালক-গণ সকলেই সম্মান করিয়া নিজের বিছানায় বসাইবার জন্য চেষ্টা পাইত। আর একদিন একটী বালক একজন অর্দ্ধবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, উনি কে? কেনই বা উঁহার সম্মান করিতে হয়? তখন তিনি কহিলেন, তুমি উঁহাকে চিনিতে পার নাই, উঁনি আবু সালেহের পুত্র, আওলিয়া পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইঁনিই সাধুপুরুষগণের রাজা, ইঁহারই নাম বড়পীর আব্-দোল কাদের জ্বিলানি। সেইদিন হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে আমি খোদাপ্রাপ্তি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, দয়াময় দয়া করিয়া আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আমিও নির্জ্জন স্থানে লোকের অগোচরে

তন্ময় চিত্তে জগৎ পিতা বিশ্বপালকের অর্চ্চনা ও সাধনা করিতে নিযুক্ত হইলাম, দয়াময় খোদাতায়ালা সামান্য দিনের মধ্যেই আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন; সেই জগতকর্ত্তা বিশ্ব পালক যখন আমার পরম বন্ধু হইয়া গেলেন, তখন আমার আর কোন বস্তুর অভাব হইল না। তিনি যেন স্বয়ং আমার হাত হইয়া গেল, এ জন্য জগতে আমার অপর একটী নাম পীর দস্তগীর; এই গৌরব-সূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া আমি জগতে কতই খেলা খেলিয়াছি, তাহা দেখিয়া কত কত লোক বিস্ময়পূর্ণ হইয়াছে এবং কত কত সাধু পুরুষ আমার সহিত হিংসা করিয়া, অধঃপতনে পতিত হইয়াছে।

ভাজা ডিম হইতে বাচ্ছা বাহির হইয়া শব্দ করিবার বিবরণ।

খাওারাকাল আখিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবুলফজল বেন কাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বসন্তের সময়ে হজরত মহিউদ্দীন জিলানি বড়পীর সাহেব দেশ পর্য্যাটনের ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, মনের আনন্দ লাভ করিবার জন্য এদেশ সেদেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; দয়াময় বিশ্ব-

পালকের বিশ্ব-রচনার কৌশল দেখিতে দেখিতে, নানা-দেশের নানা রকম ভাব বুঝিতে বুঝিতে, দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিতে করিতে অন্য একটী সহর মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সহরের মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে একটী রাজ্যের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন, পথ চলার পরিশ্রমে হজরত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সম্মুখে একটী তাববাগের (১) দোকান দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন। দোকানি নানারূপ খাবার সামগ্রী লইয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে; পোলাও, কাবাব, রুটী, মাংসের ঝোল, মুরগীর ডিম ভাজা পর্য্যন্ত রেকাবিতে সাজান আছে। সেই সময় তাব্বাগ, কয়েকটী মুরগীর ডিম লইয়া কড়ায় ফেলিয়া ঘৃতে ভাজিতেছিল। হজরত ডিম ভাজা দেখিয়া কহিল, আহা। ঐ ডিমগুলি যদি এরূপ ভাবে কড়ায় ফেলিয়া ঘৃতে না ভাজিত, তাহা হইলে ঐ ডিম হইতে বাচ্ছা বহির্গত হইয়া, পর ঝাড়িয়া উড়ে যাইয়া, কেমন চিউঁ চিউঁ শব্দ করিয়া সকল লোক দিগকে শুনাইত। এই কথা বলার শেষ হইতে না হইতেই কড়াস্থিত ভাজা ডিম হইতে বাচ্ছাগুলি বহির্গত হইয়া তখনি উড়িয়া গিয়া বাজারের মধ্যে চিউঁ চিউঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল। তাঁহার এই আশ্চর্য্য অলৌকিক

(১) তাব্বাগ,-হোটেল ওয়ালা।

কেরামত দর্শন করিয়া, শত শত লোক বড়পীর সাহেবের সেবায় নিযুক্ত হইল। এই আশ্চর্য্য কেরামতের কথা প্রকাশ হওয়াতে, প্রত্যহ সহরের সহস্র সহস্র লোক আসিয়া হজরতের কাছে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইল এবং গৃহে গৃহে পীর সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ লোকের জনতায় পীর-দরবার রাজ-দরবার হইতেও অধিকতর সুশোভিত হইতেছিল। হায়রে হিংসাপূর্ণ জগত! তোমার কি কুটিল ভাব, তুমি কি পরের ভাল দেখিতে পার না, পরের সৌন্দর্য্য কি তোমার চক্ষে তীর সম তীব্র বোধ হয়, পরহিংসায় কি তুমি কাতর হইয়া জ্বলন্ত অনলে দগ্ধীভূত হও, হে মর্ত্ত জগত! এই করিয়া না তুমি অধঃপতনে যাইতে বসিয়াছ, যাক, পৃথিবী রসাতলে যাক, ধ্বংস হউক; তথাপি যেন মহাত্মা ও পবিত্র সাধু পুরুষদিগের মহানভাব দর্শন করিতে করিতে এ পাপ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে পাই। সেই সহর মধ্যে একজন তপস্বী সাধু পুরুষ বাস করিতেন, তিনি হজরত বড় পীরের কেরামতের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, আবার তাঁহার যশকীর্ত্তনের কথা শুনিয়া পরশ্রী-কাতর সাধুপুরুষ হিংসানলে জ্বলিয়া উঠিল। মনে ভাবিল, ঐ লোকটী আমার সহরে আসিয়া যেরূপ কেরামত দেখাইয়া লোকের কাছে সম্মান পাইতেছে,

বোধ হয় আর অধিক দিন এখানে থাকিলে পরে, সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িবে, কেহই আর আমাকে গ্রাহ্য করিবে না ; হিংসাবাদী তপস্বী কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, বড়পীরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। হে পথিক ! তুমি মশাফের, দিনকতকের জন্য আমার এই দেশে আসিয়াছ ; দিনকয়েক মাত্র বাস করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইবে, তবে কেন সহরের লোক-দিগকে নানা প্রকার কেরামত দেখাইয়া আপনার বশীভূত করিয়া লইতেছ। ইহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল আমা হইতে উচ্চপদ দেখাইয়া নিজের সম্মান বাড়াইয়া আমাকে সকলের নিকট হীনাবস্থায় রাখিবে ; ইহাকি আমার প্রতি তোমার, বিদ্রোহীতাচরণ করা নয় ? কেননা আমার শত শত সেবক তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে তুমিও তাহা-দিগকে আমার অনুসরণ বা স্মরণাগত হইতে ফিরাইয়া লইতেছ, তাহারাও নির্ব্বোধের মত তোমার স্মরণাগত হইতেছে। এখন যদি আপনার সম্মান রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে শীঘ্র আমার দেশ হইতে চলিয়া যাও। হজরত বড়পীর সাহেব মদগর্ব্বিত দরবেশ সাধু পুরুষের পত্রখানি পাঠ করিয়া, দন্তে অঙ্গুলী দিয়া চিন্তা করিতে করিতে এই কোরাণের আয়েতটী পাঠ করিলেন,

"লিল্লাহে মাফিস্‌সামাওাতে ওামাফিল আরদে।"
আকাশে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই বিশ্বপালক খোদাতায়ালার। পরে পত্রের মধ্যে লিখিলেন, সমুদয় পৃথিবীর কর্ত্তা সেই বিশ্বপালক জগদীশ্বর; তিনিই অদ্বিতীয় অংশিহীন সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারই অধীনের মধ্যে ত্রিজগত আবদ্ধ আছে। আকাশ, পাতাল, নদ, নদী, স্বর্গ, বসুন্ধরা, ইহকাল ও পরকাল; সকল রাজ্যের রাজা সেই সৃষ্টিপালক জগতকর্ত্তা, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই যে সেই বিশ্বপালক জগত কর্ত্তার জগতের কর্ত্তা আপনি হইতে পারে, বা নিজের জগত বলিয়া জ্ঞান করে। যেহেতু নিজের জীবনের কর্ত্তা নিজেই হইতে পারে না। যেমন এ পৃথিবীতে দিন কয়েকের জন্য আমিও মশাফের, তেমনি তুমিও ক্ষণিক সময়ের জন্য এই জগতের মশাফের। এ জগতে সকলেরই ভবের খেলা খেল্‌তে আসা, খেলা সাঙ্গ হইলেই সকলকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে, একটু সময় লইবার চেষ্টা করিলেও সময় পাইবে না। যে সময়ে যে দণ্ডে শমন আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তোমার প্রাণপাখি লইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহা লইয়া পলায়ন করিবে, কাহার সাধ্য যে সেই পরমাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, যেমন পবিত্র

কোরাণ শরিফের সুরা ইয়ুনসের চার রুকু মধ্যে এ আয়েত আছে।

আয়েত।

এজাজায়া আজালোহোম ফালাইয়াসতা খেরুনা
সায়াতাঁও ওালা ইয়াস তাক্ দেমুনা।"

অর্থ।

যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইবে না, মহাপ্রাণী বহির্গত হইবে।

এই পর্য্যন্ত পত্রে লিখিয়া গর্ব্বিত সাধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দরবেশ পত্রটী লইয়া ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিল, পরে যখন শেষের আয়েতটী পাঠ করিলেন তৎ সঙ্গে সঙ্গেই শমন আসিয়া তাহার প্রাণ পাখি হরণ করিয়া লইয়া গেল; সাধের দেহপিঞ্জর মাটির মধ্যে পড়িয়া রহিল। এন্নালেল্লাহে ওাএন্না এলায়হে রাজেউন।

সর্পরূপে একটী দৈত্য এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার বিবরণ।

সোলতানল আজকার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,

একদিন হজরত বড়পীর সাহেব মনছুর নামক জামে মসজেদে রাত্রিকালের উপাসনা করিবার জন্য প্রবেশ করে, পরে নামাজ পাঠকালে ভূমিষ্ট হইয়া সেজ্‌দা করিতে মস্তক ভূতলে স্থাপন কবিলে, হটাৎ একটী ভুজঙ্গ আসিয়া ফণা বিস্তার কবিয়া হজরতকে বার বার দংশন করিতে লাগিল; আর সেখান হইতে কোথায় পলায়ন না কবিয়া তথায় লড়া চড়া করিতে লাগিল। হজরত সেজ্‌দা হইতে মস্তক উত্তলন করিয়া সর্পটীকে বাম হস্ত দিয়া সবাইয়া দিলেন, পবে দ্বিতীয় সেজ্‌দা করিলেন (১)। এইরূপ প্রত্যেক রেকাতেই সর্পটীকে সরাইয়া দিয়া সেজ্‌দা গুলি সম্পূর্ণ করিয়া জলসা করিলেন আর্থাৎ বসিয়া আত্তাহিয়াত পড়িতে রহিলেন। সেই সময় ফণিবর হজরতের গলা বেষ্টন করিয়া জড়াইতে লাগিল এইরূপ প্রকারে সর্প তাঁহাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতেছিল; যখন তাঁহার উপাসনা সম্পূর্ণ হইয়া গেল, তখন সেই সর্পটী অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। তাহার পরদিন হজবত আবার সেই জামে মসজেদে উপস্থিত হইলে, হটাৎ একটী অপরিচিত লোক আসিয়া সালাম করিয়া

(১) সরিয়তের বিধি অনুসাবে এক হস্তে সর্প সংহার করা কি কোন বস্তু সরাইয়া দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ হয় না।

আদব কানুনের সঙ্গে হজরতের সম্মুখে বসিয়া রহিল। তিনি সেই অপরিচিত লোকটীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন, তাহা সত্য করিয়া পরিচয় দিন। তখন তিনি অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, হুজুর! ক্ষমা করিবেন, আমি কল্য সর্পরূপে আপনাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট মহ অপরাধে অপরাধি আছি? হজরত বলিলেন, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি, নতুবা আমার ভীষণ মুষ্ট্যাঘাতে তোমাকে প্রাণ হারাইতে হইত, তোমার কোন রকমেব চাতুরি খাটিত না; এখন সত্য বল কে তুমি এবং কি জন্যই বা ভুজঙ্গরূপে মানবগণকে কষ্ট দিয়া থাক? তোমার উদ্দেশ্য কি ব্যক্তকর। তখন সে কহিল, হুজুর! বহুদিবস হইতে এইরূপ প্রকারে সর্পরূপে আমি সাধুদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি? কিন্তু আপনার মত হিংসাশূন্য মহান হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ও ধৈর্য্য বিশিষ্ট মহাসাধুপুরুষ দ্বিতীয় আর কাহাকেও পাই নাই; সেই জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আপনাব নিকট এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনুসরণ ব্রতে ব্রতী হইব কল্য সর্পরূপে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া অদৃশ্য হইয়া ছিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আর আমার বংশের পরিচয়

এই যে আমি আহবাব্বাস বংশের দৈত্য বা জেন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার ক্রীতদাস হইয়া থাকিবার ইচ্ছা করি। হজরত বড়পীর সাহেব সেই দৈত্যকে এস্‌লাম ধর্ম্মে ও অনুসরণ ব্রতে দীক্ষিত করাইয়া নিজের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

বড়পীরের আশীর্ব্বাদে একব্যক্তি ইসানবির পুনর্ব্বার আগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

তওফাতল কাদরি নামক গ্রন্থে লাহোর নিবাসি সেখ সৈয়দ মাওালি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্রমেই মনুষ্যসকল পুণ্যহ কার্য্য ত্যাগ করিয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবে বলিয়া হজরত কোতবে রব্বানি মহিউদ্দীন আব্‌দোল কাদের জিলানি রহমাতুল্যা আলায়হে অগ্রে হইতেই জ্ঞাত ছিলেন, সেই জন্য জীবের প্রতি দয়াদ্রে হৃদয়ে তাঁহাদের নানা উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, কেননা পাপীগণের পাপভারে এ পৃথিবী নিশ্চয় রসাতল গামী হইতে পারে, তাহাতে তিনি হজরত ইসা আলাহে-চ্ছালামের আকাশ হইতে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন পর্য্যন্ত এ ধরণী স্থির রাখিবার জন্য কোতব বা রক্ষক কর্ত্তা আবদাল নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন; জমালেল্লাহে পিরান

পীরের আশীর্ব্বাদে আবদাল অর্থাৎ ধরণীর রক্ষক কর্ত্তা হইয়া সর্ব্বদাই বোসতাম সহরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন এক মহাত্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃদ্ধ! আপনার বয়েস কত বৎসর হইয়াছে তাহা কি আপনি বলিতে পারেন? তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমার বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবে আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমার এই জীবনের মধ্যে কত শত রাজ্য ও রাজা ও লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ধরিত্রীদেবীর গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তবে একটু একটু জুবাকালের কথা স্বপ্নের ন্যায় মনে পড়ে, একদিন হজরত মহবুবে সোবহানি আমাকে দেখিয়া বলিয়া ছিলেন যে, জমালেল্লাহু, আশির্ব্বাদ করি তোমার বয়েস অধিক হইবে এবং তুমি হজরত ইসা আলায়হেচ্ছাল্লামের পুনর্ব্বার আকাশ হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রেরিত পুরুষ ইসানবির সহিত তুমি সাক্ষাৎ লাভ না কর ততদিন পর্য্যন্ত মৃত্যু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না; কেননা তাঁহার সহচর হইয়া তোমাকে বহুদিবস কাটাইতে হইবে, যেহেতু তিনি জগতে আসিয়া মহাপাপী খারেদজ্জালকে আঁখির পলকে ভস্ম করিয়া দিবে। তুমি যে সময় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে সে সময় সেই পবিত্র মহাপুরুষ রুয়োলকুদ্দুসকে

আমার সালাম জানাইও আবদাল জমালেল্লাহ্ সেই মহাত্মাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পরে বলিলেন, হজরত ইসার আশাপথ চাহিয়া আছি কতদিনের পরে তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া এই মায়াবিনী পৃথিবীর মায়া এড়াইয়া নিজগৃহে আগমন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিব। আর কেন, জগতের কীর্ত্তি কাহিনী সকলই দেখিয়াছি। মায়াবিনী পিশাচী পৃথিবী চক্ষের উপর অনেক খেলা খেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি আরও দেখিতে হইবে, তবে আর সহ্য হয়না, না হইলেও সহ্য করিতে হইবে, এই বলিতে বলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হজরত বড়পীরের আশীর্ব্বাদে একজন চোর কোতব হইয়া যায় তাহার বিবরণ।

লাতফ কাদরিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবু মহাম্মদগফরে রহমাতুল্যা হইতে বর্ণনা হইয়াছে যে, বোগদাদ নগরে একটী প্রসিদ্ধ চোর ছিল, সে প্রায়ই লোকের বাটীতে চুরি করিয়া আপনার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। একদিন মনে মনে যুক্তি করিয়া হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেবের অন্দর মহল মধ্যে চুরি করিবার জন্য প্রবেশ করিল। যখন চোর চুরি করিবার

ইচ্ছা করিয়া বড়পীর সাহেবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তিনি জানিতে পারিয়া সেই চোরকে গৃহ মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চোর অন্দর মহলে প্রবেশ করিবা মাত্রেই দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল, সকলই অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কি করিবে কোথায় যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে নিরূপায় হইয়া সেই ঘরের কোণে চুপটী করিয়া বসে বসে ভাবিতে লাগিল; হায়, অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া বড়পীরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়া আমার এ দুর্দ্দশা হইল, সকালবেলা আমাকে যে দেখিবে সেই বলিবে রে আহাম্মক! বড়পীরের ঘরে চুরি! এরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা কতই সহ্য করিতে হইবে, হতভাগ্যের এ পোড়া অদৃষ্টে কত প্রকারের যে শাস্তি আছে তাহাও বলিতে পারিনা, হায় হায় কেন এমন দুর্ম্মতি হইল, যে পীরের ঘরে চুরি করিতে আসিলাম। চোর এইরূপ প্রকারে নিজের ভাগ্য নিরক্ষিয়া ভাবিতে ছিল, এমন সময় খোওাজ্ঞ থাজের আলায়হে চ্ছালাম বড়পীরের নিকটে আসিয়া কহিলেন, অদ্য একটী আবদাল পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছেন, এখন তাঁহার পরিবর্ত্তে একটী সেই প্রকার উপযুক্ত লোক থাকেত বলুন। তৎ পরিবর্ত্তে তাহাকেই আবদাল করিয়া দেশ রক্ষা করা যায়। তখন হজরত বড়পীর

সাহেব একটী চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার গৃহের মধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বসিয়া আছে তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। চাকরটী তখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া বড়পীর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিল। হজরত একবার মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া, তাহাকে গোপনীয় মহাবিদ্যায় বিদ্বান করিয়া দিলেন। চোর বড়পীরের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়া জগতারাধ্য পূজ্যপদ আবদাল হইয়া গেল। খোওাজ খাজের (আঃ) তাহাকে সঙ্গে লইয়া আবদালের স্থানে আবদাল পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হজরত খাজের (আঃ) তাহাকে লইয়া অদৃশ্য হইবার পরে, কোন লোক হজরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আপনার ঘরের কোণে যে লোকটী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল সেই লোকটী কে? তখন তিনি বলিলেন, উনি একটী চোর; আমার গৃহে চুরি করিতে আসিয়া ছিল, আমি উহাকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; তবে আমার ঘরে চোর চুরি করিতে আসিয়া কিছু না পাইয়া হতাশ অন্তরে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে কেন, এজন্য উহাকে গুপ্ত বিদ্যাধন দিয়া ধনবান করিয়া দিলাম। অধীন লেখক বলেন, দাতা লোকের কার্য্যই এই দাতব্য না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পীরের কর্ত্তব্য

কার্য্য এই শিষ্যকে নিজ রঙ্গে রঙ্গিন না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। যেমন কুমরিয়া পোকা জীবিত মক্ষিকাকে নিজের গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া, তাহাকে পুনরায় নিজের বর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। তদ্রূপ পীরের কার্য্য।

হজরত বড়পীরের কুকুরে একজন তপস্বীর ব্যাঘ্র সংহার করে তাহার বিবরণ।

তালথিছল কালায়েদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবুমসউদ আহাম্মদ বর্ণনা করিয়াছেন যে আহাম্মদ জামি নামক একজন মহা তপস্বী ছিলেন; তিনি সাধনা বলে একটী ব্যাঘ্রকে বশীভূত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক একটী সর্পকে ছড়ি বানাইয়া, ব্যাঘ্রকে তাড়না করিয়া থাকিতেন এবং নিজের আশ্চর্য্য কেরামতি যেথানে সেখানে দেখাইয়া ফিরিতেন। লোকে তাঁহার এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইত, কেহ বা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিত, কেহবা ব্যাঘ্রের খোরাকের জন্য গরু আনিয়া যোগাইত, এইরূপ প্রকারে তিনি দেশ দেশান্তরে আপনার গৌরব দেখাইয়া বেড়াইতেন। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার ব্যাঘ্রের আহার্য্য

সংগ্রহ করিয়া লইতেন। একদিন আর একটী রাজ্যে গমন করিয়া একজন সাধুপুরুষের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই সাধুর নিকটে ব্যাঘ্রের আহারের জন্য একটী গরু চাহিল। সেই সাধুবর গুপ্ত বা মারফৎ বিদ্যায় মহা বিদ্যান ছিলেন, এজন্য তিনি আহম্মদ জামির ভাব দেখিয়া, উহার সমুদয় লোক দেখান ভণ্ডামি বলিয়া বুঝিয়া লইলেন, এবং আরও বুঝিলেন যে, ইঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা কেবল পৃথিবীতে লোকের নিকটে যশ লইয়া বেড়াইবেন, কিন্তু পরকাল ও খোদাপ্রাপ্তির সঙ্গে ইঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই; তখন তিনি ভাবিলেন, যাই হোক, ইঁহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য বলা আবশ্যক, যেন জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া পরম বস্তু লাভ করিতে পারে, এ মূঢ় ভ্রমে পড়িয়া কাঁচ লোভে কাঞ্চন হারাইয়া বসিতেছে; ভাল অন্ধকে চক্ষুদান করাই ভাল, পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখানই উত্তম; এই ভাবিয়া মহানুহৃদয় সাধুবর আহম্মদ জামিকে বলিলেন, হে বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বনকারী সাধু পুরুষ! তোমার যোগ সাধনার আড়ম্বর আমাকে দেখাইলে, কিছুই ফল হইবে না। অন্ধের কাছে কি রত্নের ব্যাখ্যা করিলে তাহা কি তিনি চিনিতে পারিবেন, লম্পটের কাছে কি ধর্ম্মের কাহিনী গাহিলে জ্ঞান পাইবে, নির্ব্বোধকে কি জ্ঞানদান করিলে

জ্ঞানবান হইবে, করোঞ্জা বৃক্ষে কুঠারাঘাত করিলে কি চন্দনের সুগন্ধ পাইবে, বালুকাময় মরুভূমিতে জল অন্বেষণ করিলে কি জল পাইবে, সিমুলফুলে মধু আহরণ করিলে কি মধু প্রাপ্ত হইবে, তদ্রূপ আমার কাছে যোগ সাধনার চটক দেখাইলে কি ফল ফলিবে। তবে যদি বোগদাদ যাইয়া হজরত মহবুবে সোবহানির নিকট তোমার মহা যোগ সাধনার আড়ম্বর দেখাইয়া আসিতে পার, তখন আমি তোমাকে প্রত্যহ একটী করিয়া গাভী দান করিব। আহাম্মদ জামি সাধুবরের কাছে আদর না পাইয়া ম্লানমুখে অধোবদনে বোগদাদ দিকে গমন করিলেন। পীরদরবারের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলায় বসিয়া আপনার কৃত দাসকে আদেশ করিলেন, যাও তুমি শীঘ্র যাইয়া বড় পীরের দরবারে আমার সংবাদ দিয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আপনার পীর দরবারের নিকটে মহাম্মদ জামি প্রবল পরাক্রম মহা তেজস্বী সাধু পুরুষ ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন, যেন তিনি আমার ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের জন্য একটী গাভী পাঠাইয়া দিয়া আমার সম্মান রক্ষা করেন। তৎপরে চাকরটী প্রভুর আদেশ লইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বড়পীরের দরবারে সমুদয় বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াদিল। তাহা শুনিয়া হজরত গওসে সামদানি মহবুবে সোবহানি একবার বৃক্ষমূলের দিকে

কটাক্ষনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন যে, আগন্তুক গাভী ভিক্ষাকারী সাধু পুরুষ বিশাল নয়না মহা বলিষ্ঠ তেজঃপুঞ্জ শরীরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বৈরাগ্য বেশে প্রচণ্ড আকার বিশিষ্ট একটী ব্যাঘ্রের উপর বসিয়াছেন। হজরতের তাঁহার শরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ বেশ দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইতে, আর কিছুই বাকী রহিল না। তখন সেই চাকরটীকে বলিয়া দিলেন, যাও তুমি তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বল; আমি এখনই তাঁহার বাহনের খাদ্যের জন্য একটী গাভী অন্বেষণ করিয়া পাঠাইতেছি, আজ তিনি আমার অতিথি অবশ্যই আমাকে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে হইবে, আমার দরবারে আসিয়া অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে, আমি সেই অন্তর্য্যামী সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতালার নিকটে কি বলিয়া উত্তর করিব। চাকর বিদায় হইয়া প্রভু সন্নিধানে, বড়পীর সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় একে একে শুনাইয়া দিল। সাধুবর চাকরের মুখে শ্রবণ করিয়া, আত্ম গরিমায় মত্ত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার আশ্চর্য্য কেরামত দেখিয়া, বড়পীর সাহেব নিশ্চয় স্তম্ভিত হইয়াছেন একটু মনে মনে ভয়ও পাইয়াছেন; তাত পাইতেই পারেন! এ ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া কে না ভীত হয়; বড়পীর ত একজন মানুষ তবে কেন আমার ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় পাইবেন না;

যদি না তিনি ভয় পাইতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি আমার ব্যাঘ্রের জন্য গাভী পাঠাইতে স্বীকার পাইতেন না। পরে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য বড়পীর সাহেবও আমার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, ভণ্ড তপস্বী অহঙ্কারে উম্মত্ত হইয়া এইরূপ কতই কি বলিতে ছিলেন। এখানে তাপসকুলচুড়ামণি পীরশ্রেষ্ঠ মহবুবে সোবহানি রন্ধন শালার একটী চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি অতিথির ব্যাঘ্রের খোরাকের জন্য একটী মোটা তাজা গাভী লইয়া যাও চাকরটী পীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একটী হৃষ্টপুষ্ট গাভী লইয়া গমন করিল, সেই সময় বড়পীর সাহেবের একটী বৃদ্ধা কুকুর আসিয়া গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রোধভরে চলিতে লাগিল। গাভী লইয়া চাকরটী আহম্মদ জামিকে কহিল হুজুর। আপনার ব্যাঘ্রের আহার জন্য পীর সাহেব এই গাভীটীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সাধুবর ব্যাঘ্র হইতে নীচে নামিয়া, সেই ব্যাঘ্রটীকে ইসারায় কহিল ঐ তোমার খাদ্য বস্তু উপস্থিত, আর কেন, ভক্ষণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর। রক্তপিপাসিত মাংসলোলুপী হিংস্রক জন্তু আর কি সহ্য করিতে পারে প্রভুর আদেশ মাত্রেই ভীষণাকারে অঙ্গ ঝাড়া দিয়া গাভীটীকে যেমন আক্রমণ করিল, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই সেই কুকুরটী এক লম্ফেই

ব্যাঘ্রের ঘাড়ে কামড় দিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল, তিন চার কামড়েই পীরের কুকুর সাধুর বাঘকে মারিয়া ফেলিল। আহাম্মদ জামি পীরের কেরামত ও কুকুরের ক্ষমতা দেখিয়া এই বয়েত পড়িয়া বলিতে লাগিল ;—

বয়েত।

সাগে দরগাহে জিলান শোদ্ব খাওাহি কোরেব রব্বানি।
কেবর শেরাঁও শরফ দারদসাগ দর্গাহে জিলানি॥

অর্থ।

এমন সাধুতায় মোর নাহি প্রয়োজন।
বড়পীরের সেবায় এখন কাটাব জীবন॥
সাধু হৈতে উত্তম গুণ কুকুর পীরের।
যে হেতু সংহার প্রাণ করিল বাঘের॥

সাধুবর পীরের কুকুরের অশেষ ক্ষমতা দেখিয়া সেই দিন হইতে বড়পীরের দরবারে থাকিয়া, পরকাল প্রাপ্তির জন্য কিঞ্চিৎ গুপ্তধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আর কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, বড়পীরের কুকুর ব্যাঘ্রকে উদরস্থ করিয়া পুনরায় পীরের আদেশে জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রটীকে উদগার করিয়া দিয়াছিল।

একজন খৃষ্টান দরজী হজরত বড়পীরের নিকটে মুসলমান হয় তাহার বিবরণ।

আনসল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ বাহারল হক কুদ্দস সর্‌হু বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, সে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য, হজরত বড়পীরের কাপড় ও পিরহান সেলাই করিয়া দিনপাত করিত। সদা সর্ব্বদা পীর দরবারে থাকিয়া এসলাম ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইত, খোদাতায়ালা একাই যে সমুদয় জগতের অধীশ্বর তাঁহার কেহই যে অংশী নাই এবং তাঁহার পুত্র পরিজন নাই, তিনি কাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই লোকটী এ কথা ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ইসায়ী পাদ্‌রিগণের মতে যিশু অর্থাৎ হজরত ইসা নবি যে খোদাতায়ালার পুত্র, এ কথা যে সম্পূর্ণ অলিক, তাহাও তার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল, ততই সে এসলামধর্ম্ম সত্য কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সত্য অসত্যের বিচার করিতে করিতে কয়েক

দিন অতিবাহিত করিয়া দিল। আবার কয়েকদিন পরে মনে মনে ভাবিল, "মহাম্মদ যথার্থ সত্যধর্ম্ম প্রচারক। যাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের বা ইঞ্জিলের অনেক স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের খ্রীষ্টানগণ চাতুরি করিয়া, উহা হজরত ইসার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া প্রচার করেন। এখন বিশদরূপে বুঝিতে গেলে আমাদের ইঞ্জিল ও তওরাতে হজরত মহাম্মদ শেষনবী সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। যে হেতু হজরত ইসানবি বলিয়া গিয়াছেন, 'আমি যে সময় তোমাদের নিকট ছিলাম সে সময় এই সকল কথা বলিয়া গিয়াছি যে, সেই শান্তিময় কর্ত্তা, যে পবিত্র আত্মাকে জগতে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয় তোমাদিগকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন।' এখন আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না; যে হেতু আমি না গেলে শান্তিময় কর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে অবশ্যই তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমাদের গ্রন্থে পূর্ব্বাদেশ স্মরণ

করাইতে, ধর্ম্ম আদেশ গুলি শিক্ষা দিতে, শেষ প্রেরিত পুরুষ হজরত মহাম্মদ (সঃ) নবি এবং তিনিই মহা গ্রন্থ কোরকাণ শরিফ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ পবিত্র কোরাণ হইতেই বোঝা যাইতেছে। "আস এস্‌লামো হাক্কুন অল কোফবো বাতেলোন" অর্থাৎ দিন এস্‌লাম সত্য আর কুফরিধর্ম্ম অসত্য হায় হায়, সৎপথে গমন না করিয়া সত্য ধর্ম্মে না চলিয়া অজ্ঞানের মত ভ্রমে পড়িয়া অসৎ কর্ম্মে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিলাম, কখন সুরা পানে, কখন ব্যভিচারে, কখন অখাদ্য খা অবৈধ শুকর মাংস খাইয়া, সয়তানের কুচক্রে পড়িয়া বিষয় কার্য্য সকল হারাইতে বসিয়াছি। এখন কোনটী সত্য কোনটী অসত্য তাহাও বাছিয়া লইলাম না। যখন এই নশ্বর জগত ছাড়িয়া পরকালে জগত কর্ত্তা খোদাতায়ালার নিকটে গমন করিতে হইবে এবং পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হইবে, তখন তাঁহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব। এখন উপায় করিলে, চেষ্টা দেখিলে, তবেত পরকালে মুক্তি-লাভ করিতে পারিব। এখনও যদি সুপথ প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখি, পরকালে পার হইবার কর্ণধার হজরত বড়পীর সাহেবকে ধরি, তবে নিশ্চয় ভবপারে পার হইব। তাঁহার চরণতলে পড়িলে অবশ্যই তিনি পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখাইবেন, ভবপারে পার করিতে

হইলে এসময় বড়পীর ব্যতীত আর অন্য নাবিক নাই; উপযুক্ত কর্ণধার তিনই, তাঁহারি এস্‌লাম তরিতে আরোহণ করিয়া যদি ভবপারে পার হইতে পারি, তবে এই সময় হইতে তাহার চেষ্টা করি, যিনি ভব-নদী পার করিবার কর্ত্তা তাঁহারি নদীর তীরে বসিয়া থাকি, বৃথা কেন বক্রি সময় টুকু নষ্ট করিয়া ফেলি। খ্রীষ্টান দরজি এই ভাবিয়া হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেবের নিকটে যাইয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে ও অনুস্মরণ ব্রতে দীক্ষিত হইল। হজরত বড়পীর সাহেব তাহাকে এস্‌লাম ধর্ম্মের রীতি নীতি গুলি ভালরূপ প্রকারে শিক্ষা দিয়া, সরল পথ দেখাইয়া দিলেন। নব দিক্ষিত মুসলমান এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সকল পথের সন্ধান বুঝিয়া আরও ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল। হায় হায় পূর্ব্বে জানিতাম না যে স্বর্গে যাইতে পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, মনে করিতে গেলে হৃদপিণ্ড শুখাইয়া যায়, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কি ভয়ানক পথ। প্রথমাবস্থায়—মৃত্যু সময় কি কঠিন যন্ত্রণা, দ্বিতীয়—মনকের নকির আসিয়া কঠিন প্রশ্ন করিবে, তাহার প্রশ্নের প্রতি-উত্তর দিতে না পারিলে ভয়ানক বিপদ; তৃতীয়—কবর সমাধিস্থ স্থানে এই পৃথিবী কঠিন কঠিন শাস্তি করিবে, গণ্ডিগাছে যেমন ইক্ষুপেষণ করে তদ্রূপ মৃত্তিকায় অস্থি

পাঞ্জর ইত্যাদি সর্ব্ব শরীরটীকে পেষণ করিবে, হায় হায়, কবরে কি ভয়ানক শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। তৃতীয়তে হাসর মাঠে সকল কার্য্যের হিসাব নিকাস দেওয়া কি ভয়ানক ব্যাপার! এইরূপ প্রকার চিন্তা করিয়া হজরত বড়পীর সাহেবের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, হুজুর! পরম গুরু পতিতপাবন, অধম তারণ, অকুলের কুলকাণ্ডারি ভব পারের কর্ণধার! বলুন—কবরের শাস্তি ও মনকের নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের কঠিন প্রশ্ন হইতে কেমনে রক্ষা পাইব? তখন দয়ার আধার, পীরগুণধর শিষ্যকে বলিলেন, তুমি নির্ভয় অন্তরে থাক, তজ্জন্য তোমাকে ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। যখন তোমার সমাধিস্থলে মনকের ও নকির স্বর্গীয় দূতদ্বয় ভয়ানক মূর্ত্তিতে আসিয়া দিন ধর্ম্ম ও ঈমান বিশ্বাসের বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগকে এই প্রতিউত্তর দিও? কেবলমাত্র আমার নাম উচ্চারণ করিও, তাহা হইলেই তাঁহারা তোমাকে অন্য আর কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবেন; সাবধান আমার নাম ব্যতীত আর কিছু বলিবার চেষ্টা করিও না। কিছুদিন পরে নব দীক্ষিত মুসলমানটী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সকলে তাহার সদগতি করিয়া যে যাহার নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলে, ওদিকে কবর মধ্যে মনকের নকির স্বর্গীয় দূতদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে ভীমরবে

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কবরস্থিত ব্যক্তি! সত্য করিয়া বল তোমার দিন ইমান কি? তখন তিনি বলিলেন, আমার দিন ও ইমান "মহিউদ্দীন আব্‌দোল কাদের" ফেরেস্তাদ্বয় এই উত্তর পাইয়া নিরব হইয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পরে খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিলেন।

"ইয়া রাব্বাল আরদে ওাস্‌সামায়ে আন্‌তা
তায়ালামোল জাহেরা ওামা ইয়াখফা।"

অর্থ।

হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিপালক, দাতা দয়ালু খোদাতায়ালা অন্তর্য্যামী! তুমি গোপন ও প্রকাশ্যের সমুদয় তত্ত্বই অবগত আছ, তোমার অবিদিত জগত মধ্যে কিছুই নাই। আমরা যাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছি, সেই ব্যক্তি তোমার বন্ধুবর মহবুবে ময়গুব, মহিউদ্দীন আব্‌দোল কাদের নাম ব্যতীত আর অন্য কিছুই প্রতিউত্তব দেন নাই। এখন ইঁহার জন্য যাহা আদেশ হয় আমরা তাহাই করিতে বাধ্য। তখনই দাতা দয়াময় বিশ্বপালকের নিকট হইতে আদেশ হইল, আমার পরম সুহৃদ বন্ধুবরের নামের গুণেই আমি উহাকে কৃপা করিয়া কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়া এবং কঠিন সেতু পার করাইয়া, হিসাব হইতে নিষ্কৃতি

দিয়া, সর্ব্ব উৎকৃষ্ট স্বর্গমধ্যে স্থান দিব। এখন উহার জন্য স্বর্গের ছিদ্র দিয়া স্বর্গসুখে সুখী করিয়া এ কবর মধ্যে স্বযত্নে রক্ষা করিব প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মনকের নকিরদ্বয় তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং তৎদণ্ডেই স্বর্গের সুশীতল সমীরণে মৃতার প্রাণ ঠাণ্ডা হইল, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের সুগন্ধ আসিয়া তাঁহার সমাধি স্থান আমোদিত করিয়া দিল। অধম লেখক বলেন, যে ব্যক্তি পরম গুরুর আজ্ঞা পালনে বাধ্য হয়, তাঁহার প্রতি তাঁহার পীর অনুগ্রহ করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; ঈশ্বরও তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া শান্তি বারি বর্ষণ করেন। কিন্তু ভণ্ড গুরুর ভক্ত হইলেই তাঁহার ইহকাল ও পরকাল সকলই নষ্ট হয়।

একজন এমনবাসী খৃষ্টান বড়পীরের নিকট মুসলমান হয় তাহার বিবরণ।

মেরাতল ফায়েজান নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুমসউদ কাদরি হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন এমনদেশ হইতে একজন খৃষ্টান আসিয়া

হজরত বড়পীরের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইল হজরত তাহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনি কি বুঝিয়া ইসায়ী ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। নব দীক্ষিত মুসলমানটী কহিলেন, হুজুর! আমি সদা সর্ব্বদা সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতাম এবং জগত পিতা বিশ্বপালকের নিকটে করপুটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম হে জগদীশ্বর! আপনার সত্য ধর্ম্ম এ সময় কোনটী তাহা আমাকে চিনাইয়া দাও, তাহা চিনিতে পারিলেই তবে আমি তোমাকে চিনিতে পারিব, নতুবা আমার দশা কি হইবে। প্রভু! আমি কোন ধর্ম্মে থাকিলে সত্য পথ পাইয়া তোমার অর্চ্চনা ও সাধনা করিতে করিতে বক্রি জীবন টুকু কাটাইয়া দিই? হে খোদাতায়ালা! আমি জগতের সুখ চাইনা, সম্মান চাইনা, সম্পত্তি চাইনা, চাই কেবল তোমাকে; যাহাতে আমি পরকালে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব তাহাই চাই। যে দিন আমি সরল মনে সরল পথ প্রাপ্ত হইবার জন্য তন্ময়-চিত্তে দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি সেই দিন হইতেই আমার মন প্রাণ এস্‌লাম ধর্ম্মের দিকে ধাববান হইল। এমন কি ঐ কথাটী স্মরণ হইবার

পরেই আমার সর্ব্ব শরীর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আবার ভাবিতে লাগিলাম, যদি কোন উপযুক্ত সাধু পুরুষ আমার ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া, হজরত ইসা আলায়হেস্সালামের মত বৈরাগ্য বেশে নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বর আরাধনায় নিমগ্ন হই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন স্বপ্নে হজরত ইসা নবি আসিয়া দেখা দিলেন, তৎপরেই আমাকে কহিলেন, হে প্রভু ভক্ত সত্য পথ অন্বেষণকারী। তুমি বোগ্‌দাদ শরিফ যাইয়া হজরত আব্‌দোল কাদের মহবুবে সোবহানি রহমাতুল্লা আলায়হের নিকটে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, মনের ইচ্ছা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলে, তিনি তোমাকে দয়া করিয়া গুপ্ত তত্ত্বের সন্ধান বলিয়া সাধুগণের যে পথ সেই পথ দেখাইয়া দিবেন। এই পঞ্চম শতাব্দির মধ্যে হজরত বড় পীর সাহেবের তুল্য জগতে দ্বিতীয় এমন কেহ আর সাধু পুরুষ নাই। যাও শীঘ্র তাঁহার নিকটে অনুসরণ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধ্যান হইলেন, তখনই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে স্বপ্নের কথা স্মরণ হইতে এমন দেশ ত্যাগ করিয়া বোগদাদ শরিফে আসিয়া আপনার স্মরণাগত হইয়াছি, এখন কৃপা করিয়া এ অধমের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিন।

হজরত বড়পীর সাহেব তাঁহাকে গুরুমন্ত্র দানে সাধুদিগের পথ দেখাইয়া গুপ্ত বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া দিলেন।

অন্বেষণ কর তাঁরে পাইবে নিশ্চয়।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, বিধির কৃপায়॥

হজরত বড়পীরের প্রস্রাব দর্শন করিয়া চারশত ইহুদী মুসলমান হয় তাহার বিবরণ।

মনকাবে আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুল মায়ালি (রঃ) বলিয়াছেন যে, একবার হজরত মহবুবে সোবহানি রহমাতুল্লা আলয়হে কঠিন বিয়ারামে পড়িয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহার সে অবস্থা দর্শন করিলে, যাহার পাষাণ হৃদয়, তাহারও প্রাণে আঘাত লাগিয়া বিদীর্ণ হয়। সে অবস্থা দর্শন করিলে বর্ষাকালের ঝরণার ন্যায় আঁখি পল্লব হইতে জল পড়িতে থাকে। পথিকের প্রাণেও ব্যথা লাগে। তাহাতে তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলীগণ কি আর থাকিতে পারে? কাতরাবস্থা দর্শন কবিয়া ভক্তগণ বলিলেন, হুজুর! আপনি বিয়ারামে পড়িয়া যেরূপ কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া

আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা হইতেছে, আপনি যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে একজন বিজ্ঞ হাকিম আনাইয়া আপনাকে দেখাই। তখন তিনি বলিলেন, আমার বিয়ারাম আরোগ্য করিবার জন্য হাকিম আনয়ন করায় আমার বন্ধুর অসম্মান করা হয়, কেন না হাকিমের নিকটে বিয়ারামের পরিচয় দিতে আমার পরম বন্ধু বিপদ বিনাশক অন্তর্য্যামী খোদাতায়ালার গ্লানি করা হইবে। আমার ব্যাধি আরোগ্যকারী সেই শান্তিময় জগতকর্ত্তা। আমি তাঁহাকে ব্যতীত আর অন্য কাহারও নিকট সাহায্য চাহি না ও কাহাকেও আমার সাহায্যের জন্য আনায়ন করিব না, যে হেতু সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা সকল স্থানেই বর্ত্তমান। যখন তাঁহার পরম বন্ধু এব্রাহিম (আঃ) নমরূদ কর্ত্তৃক অগ্নিতে নিক্ষেপ হইয়াছিলেন তখন ঈশ্বর তাঁহাকে সেই প্রবল জ্বলন্ত হুতাশনে রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন হজরত মুসাকালিমুল্লা ফেরাউন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নীল নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, তখন সেই দাতা দয়ালু তাঁহাকে সলিল মধ্যেই পথ প্রশস্ত করিয়া রক্ষা করেন এবং ঐ নদী গর্ভেই পাপিষ্ঠ ফেরাউনের প্রাণ সংহার করিয়া ভক্তকে আনন্দিত করেন। যখন হজরত ইউমুছ (আঃ) তরণীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে সময় নাবিকগণ তাঁহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণার সহিত সমুদ্রে

ফেলিয়া দেয়। তখন একটী মৎস্য আসিয়া হজরত ইউনুছ নবিকে উদরস্থ করিয়াছিল। যে খোদাতায়ালা ইউনুছ আলায়হেস্সাল্লামকে মৎস্যগর্ভে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কি আমার নিকটে নাই? তবে কেন আমি অন্য চিকিৎসক আনায়ন করিতে আদেশ করিব। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই হজরতের প্রস্রাব ত্যাগ করিবার বেগ হওয়াতে খেদমতগার একটী পাত্রে আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল। হজরত সেই পাত্রে প্রস্রাব করিয়া চাকরটীকে লইয়া যাইতে বলিলেন, খেদমতগার পাত্রটী লইয়া যাইবার সময়ে কহিল, হজরত! আজ্ঞা করুন ত কোন হাকিমকে প্রস্রাব দেখাইয়া রোগের পরীক্ষা করাইয়া আসি। হুজুর আজ্ঞা করিলে, খেদমতগার পাত্র লইয়া একজন বিখ্যাত ইহুদী হাকিমের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে সেই পাত্রটী রাখিয়া দিল। সেই ইহুদী হাকিম সাহেব, পাত্রের প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া, খেদমতগারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই পাত্রের মধ্যে কাহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে আনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল। ভৃত্য কহিল, তাঁহার নাম হজরত মহবুবে সোবহানি সৈয়দ আব্দোল কাদের জিলানি রহমাতুল্লা আলায়হে। ইহুদী হজরতের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন, "ফাহাজাল

মারজো ইল্লা মারাজো এসৃকে এলাহি” অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেমেব বিয়ারাম ভিন্ন অন্য বিয়ারাম নয়। এই বলিয়া তিনি ভক্তিভরে মহা বচন উচ্চারণ করিলেন, “লাএলাহা ইলাল্লাহু মহাম্মদোর রাছলোল্লাহ্” ঈশ্বর ব্যতীত উপায় নাই, মহাম্মদ তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক রছুল। এই বলিয়া তিনি তখনই মুসলমান হইয়া গেলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইহুদী পল্লী হইতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, কেহবা তাঁহার নিকটে যাইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল, দেখে যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধের ফোয়ারা ছুটিয়াছে; তাহা দেখিয়া কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বুঝিয়া মুসলমান হইলেন। তখন তিনি পাত্র দেখাইয়া বলিলেন, বলায় আর আবশ্যক কি তোমরা উহা দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। যখন তাহারা পাত্রের কাছে যাইয়া দেখিতে পাইল, সেই পাত্রের প্রস্রাব হইতে মেশকো, আতর, আম্বর ও গোলাপের সুগন্ধিতে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। তখন তাহাবা সকলেই কহিল, পাত্রটী যাঁহার, নিশ্চয় তিনি মহান সাধুপুরুষ পরম তাপসিক অলি স—আল্লাহ্; এই বলিয়া সকল ইহুদীগণ পবিত্র কলেমা অর্থাৎ মহা বচন পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেল। এমন কি চারি শতের অধিক ইহুদীগণ স্ব পরিবারে খেদমতগারের

সমভিব্যাহারে বড়পীর সাহেবের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হজরত বড়পীর সাহেব সেই ভৃত্যের মুখে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইলেন। তাহারা যখন একত্রিত হইয়া পিরান পীরের সম্মুখে দাঁড়াইল, হজরত তাহাদের প্রতি যে কৃপা দৃষ্টিতে চাহিলেন তাহাতেই তাহারা গুপ্তবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া মহা তপস্বী সাধু হইয়া গেলেন। তৎপরে সকলেই হজরতের নিকটে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সুপথে গমন করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

সাধুর সৌরভে, মত্ত হয় যবে, জগতের অলিকুল।
লভিতে সে ধনে, বাঞ্ছা সদা মনে, তাই প্রাণ হয় ব্যাকুল॥

একজন খৃষ্টান ও একজন মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করে তাহার বিবরণ।

মনজের আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন হজরত গওসল আজম রহমাতুল্লা আলায়হে পথিমধ্যে যাইতেছিলেন, দেখিতে পাইলেন যে, দুইটী লোক যাইতে যাইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক

করিতেছে। তাহাদের দুই জনের মধ্যে একজন এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বি মুসলমান, দ্বিতীয় ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বি ইসায়ী। মুসলমান—আপনার ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত পুরুষের কথা বলিলেন, হে ইসায়ী। তুমি জাননা কি তিনি সৃষ্টি না হইলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, পাতাল, নদ, নদী, দেব, দৈত্য কিছুই হইত না। প্রথমেই আল্লার প্রেরিত পুরুষের নুর জ্যোতিঃ সৃষ্টি হইয়া সেই জ্যোতি হইতেই সকল বস্তুর সৃজন হয়। সেই শেষ নবির পৃষ্ঠেই মহর নবুওত অঙ্কিত, তাঁহারই পৃষ্ঠদেশে মহা বচন লিখিত আছে "লাএলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মদোর রাসুলো-ল্লাহে" তাঁহারই পৃষ্ঠদেশের মহর নবুওতের চিত্র আঁকিতে গিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি সুরিয়া নিবাসী সোলেমান ফার্‌সি রাজি আল্লা আনহো এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রতি দয়াময় দয়া করিয়া মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরাণ শরিফ অবতীর্ণ করেন। তাঁহারই সত্য ধর্ম্ম পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রচার হইয়া পড়ে, তাঁহারই লকব সাকিয়েল মজ্‌নবিন, রহমাতুল্লেল আলামিন, অর্থাৎ সেই পুজ্যপদ নবি তাঁহার উম্মত মণ্ডলীর উপরে তিনি দয়ার সাগর, পরকালে কেয়ামতের দিবসে পাপী মণ্ডলীর সহায় কর্ত্তা, তাঁহার দয়ার ও ব্যাখ্যার শেষ নাই, সেই নবির উম্মত আমি, যিনি মেয়ারাজ রজনীতে স্বর্গ, নরক ও সপ্ত

আকাশ দর্শন করিয়া খোদাতায়ালার সহিত নব্বুই সহস্র কথা কহিয়াছিলেন। যাঁহার কথা অবিশ্বাস করিয়া একজন ইহুদী পুরুষ, স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া সাতটী সন্তান প্রসবের পরে পুনরায় পুরুষ অঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তাহা শুনিয়া ইসায়ী আপন প্রেরিত পুরুষ ইসা নবির ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল, হে মহাম্মদি! যখন আমাদের ইসানবি জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহুদীগণ হজরত মরিয়ম ইসার মাতাকে ব্যভিচারিণী অপবিত্রতা রমণী বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে তিনি বিরক্ত না হইয়া নিজের অপবাদ দূর করিবার জন্য আপন সন্তানকে সাক্ষ্য করিলেন। ইহুদীগণ মরিয়মের পবিত্রতার বিষয়ে বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, তখন হজরত ইসা (আঃ) দুই দিনের শিশু মাত্র এবং মাতার পবিত্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, দেখুন, তখন তিনি দুই দিবসের বাল্যাবস্থায় কথা কহিয়াছিলেন। আর তাঁহার বাক-শক্তি এতদুর পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি ছিল যখন তিনি যাহাকে যে আশীর্ব্বাদ করিতেন তখনই তাহা তাঁহার জন্য ফলদায় হইত। কথায় কথায় বিমারাগি দিগকে দয়া করিয়া আরোগ্য করিয়া দিতেন, অন্ধকে চক্ষুদান করিতেন, মৃতাকে জীবিত করাইতেন। এমন কি ইসা মসিহ্ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, দেশ দেশান্তরের মৃতদিগকে

"কোমবাজ্‌নাল্লাহ্" বলিয়া জীবিত করাইয়া দিতেন। এই বলিয়া তিনি মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার ইসামসিহের যেমন ছিল, তদ্রূপ তোমার নবি কি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারিতেন, বল দেখি? তোমার নবি অপেক্ষা ইসা নবির এ ক্ষমতা বেশী ছিল কি না? মুসলমানটী হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) য়ের মৃতকে জীবিত করা বিষয়ে অজ্ঞ থাকায়, আর কিছুই উত্তর করিতে না পারিয়া, আপনাকে পরাভব মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া হজরত বড়পীর সাহেব ইসায়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি যাঁহা কিছু হজরত ইসা আলায়হেস্ সাল্লামের গুণ বর্ণনা করিয়াছ তাহা সকলই সত্য, একটী কথাও অসত্য নয়। তবে কেবল হজরত ইসা মসিহ্ যে মৃতকে জীবিত করিতেন, আর আমার পয়গম্বর হজরত মহাম্মদ (সঃ) কি মৃতকে জীবিত করেন নাই? তাহা তোমরা উভয়ে কেহই জ্ঞাত নহ, এজন্য বোধ হয় বলিতে পারিলে না, শুন, আমি তাঁহার মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

যে সময় হজরত মহাম্মদ (সঃ) পেরিতত্ত্বলাভ করিয়া, এস্‌লাম ধর্ম্ম স্বগৌরবে প্রচার করেন, সেই সময়ে এমন হইতে একদল খৃষ্টান ইসায়ী হজরতের নিকটে মুসলমান

হইবার জন্য পবিত্র মক্কাধামে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু পথিমধ্যে বিধর্ম্মীগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা প্রথমেই হজরতের কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন আবুজেহেল তাহাদিগকে কহিল, তোমরা মহাম্মদের অন্বেষণ কি জন্য করিতেছ? তাঁহার সঙ্গে তোমাদের আবশ্যক কি? তখন এমন বাসীগণ কহিল, তোমাদের মক্কার মধ্যে যিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহার নিকটে আমরা এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইবার জন্য আসিয়াছি। আবুজেহেল উপহাসচ্ছলে কহিল, তোমরা যদি মহাম্মদকে (সঃ) প্রেরিত পুরুষ তত্ত্ব-বাহক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক, তবে তাঁহার নিকট কোন একটী মাজেজা অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া লও, তাহা যদি তিনি দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট মুসলমান হইও এবং তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিও, তিনি যদি বহু দিবসের মৃত ব্যক্তিকে কবর্ হইতে জীবিত করাইতে পারেন, তবে আমরাও তোমাদের সহিত মুসলমান হইব। এমন বাসীগণ তাহাদের কথায় সম্মত হইয়া মক্কার ধর্ম্মদ্রোহীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হজরত মহাম্মদ (সঃ) এর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাপুরুষ সত্যধর্ম্ম প্রচারক! আমরা এমন হইতে আপনার নিকটে আসিয়াছি, আপনি কবরস্থিত

মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করাইয়া যদি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই একাগ্রচিত্তে সকলেই আমরা মুসলমান হই। হজরত মহাম্মদ (সঃ) কহিলেন, ভাল চল এখনই কবরস্থানে গমন করি। এই কথা শুনিয়া সকলেই কবরস্থানে গমন করিল, মক্কার শত সহস্র লোক দেখিবার জন্য আসিয়া একত্রিত হইল। তাহার মধ্যে একজন প্রাচীন বৃদ্ধ তিনি পিতৃপুরুষগণের মুখে ক্রমান্বয় শুনিয়া আসিতেছিলেন যে, এখানে বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত একটী সমাধি আছে, কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই নাই, কেবল প্রবাদ ছিল যে, এইস্থানে কোন লোকের একটী কবর আছে। সেই প্রাচীন বৃদ্ধ হজরত মহাম্মদ (সঃ) কে, বলিলেন, আপনি এই কবরস্থিত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া দেন। হজরত রসুল করিম (সঃ) সেই কবরদিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবার পরে একটী ভীমকায় মহাবলবন্ত পুরুষ দুই হস্তে দুইটী অগ্নিময় মন্দিরা বা করতাল লইয়া, কবর হইতে উত্থিত হইয়া দাড়াইল এবং হজরতকে আপনার সালাম জানাইল। হজরত সালামের উত্তর দিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী? তিনি কহিলেন, আমি মুসায়ী ধর্ম্মাবলম্বী ইহুদী। হজরত মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পরে আমার মৃত্যু

হয়, সেই অবধি আমি কবর মধ্যে নানারূপ প্রকারের শাস্তি ভোগ করিতেছি। হজরত কহিলেন, জগতে এমন কি পাপকার্য্য করিয়াছিলে যে, তজ্জন্য এরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছ। সে ব্যক্তি কহিল, হজরত! আমি জগতে গান গাহিয়া মন্দিরা বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম তজ্জন্য আমার হস্তে অগ্নিময় মন্দিরা দুইটী, ইহার উত্তাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া ছাই ভস্ম হইয়া যায়। পুনরায় হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য করিয়া বল, আমি রসুল কি না। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আপনি শেষ প্রেরিত রসুল, আপনারই সংবাদ তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে আছে আমিও ভক্তিভরে আপনার কলেমা উচ্চারণ করিতেছি, "লাএলাহা ইল্লাহু মহাম্মদ রাসুলোল্লাহে" ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য দেবতা নাই মহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত রসুল। তিনি এই মহাবচন পাঠ করিতেই তাঁহার হস্তস্থিত অগ্নিময় মন্দিরা দুইটী ভূতলে পড়িয়া গেল, তিনিও লোক লোচনের অদৃশ্য হইয়া কবর মধ্যে লীন হইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া এমন বাসীগণ ও অন্যান্য কোরেশগণ পবিত্র কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল, কিন্তু হতভাগ্য দুর্ম্মতি আবুজেহেল মস্তক হেট করিয়া পলায়ন করিল। হে ইসায়ী খৃষ্টান! তোমার ইহাতেও যদি দৃঢ়

বিশ্বাস না হয়, তবে আমি একজন সামান্যলোক হজরত মহাম্মদ (সঃ) য়ের উম্মত। এস, আমার সমভিব্যাহারে এস, মৃতকে জীবিত করিয়া তোমাকে দেখাই। ইহা শুনিয়া নাছরাণী, হজরত গওসে সামদানি আব্দোল কাদের জিলানি বড়পীর সাহেবের সঙ্গে কবরস্থানে চলিয়া গেল। একটী পুরাতন কবরের নিকটস্থ হইয়া বড়পীর সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, উঠ, "কোমবাজনাল্লাহ" এই শব্দ বলিবামাত্র কবরস্থিত মৃত জীবিতাবস্থায় উঠিয়া বড়পীর সাহেবকে সালাম জানাইলেন। হজরত পীর-সাহেব তাহার সালামের উত্তর দিয়া, তাহাকে নিজস্থানে গমন করিতে বলিলেন। পরে সেই ইসায়ীকে বলিলেন, আমাদের যখন ঈশ্বর কৃপায় মৃতকে জীবিত করিবার ক্ষমতা আছে, তখন তিনি যে পারিবেন না বা পারেন নাই এ কথা কে আর অবিশ্বাস করিবে। যখন আল্লাহু তায়ালা সকল পয়গম্বর হইতে হজরত মহাম্মদ (সঃ) কে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন, যখন তিনি অঙ্গুলির ইসারায় চন্দ্রকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তবে তাহা হইতে ঈশ্বর কৃপায় মৃতকে জীবিত করা কি অতি আশ্চর্য্য বিষয় ? ইসায়ী ব্যক্তি উম্মতে মহাম্মদির এ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তিভরে মহাবচন পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ বড়পীর সাহেবের নিকট মুসলমান হইয়া,

সেই দিবস হইতে তন্ময়চিত্তে খোদাতায়ালার উপাসনা ও আরাধনা করিতে লাগিল।

একজন সদাগরের স্বপ্নযোগে ডাকাতী হইয়া ধনে প্রাণে বাঁচিয়া যায় তাহার বিবরণ।

তওফাতল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, বোগদাদের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে, শেখ হাম্মাদ নামক একজন মহাতপস্বী সাধুপুরুষ বাস করিতেন, তাঁহার একটী পরম ভক্ত সদাগর শিষ্য ছিল; তিনি গুরুর বিনা আদেশে কখনই কোন কার্য্য করিতেন না, গুরুদেব যখন যে আজ্ঞা করিতেন, সদাগর তখনই তাহা পালন করিতেন। একদিন বিদেশে বাণিজ্যে যাইবার ইচ্ছা করিয়া, আপন গুরুর নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, প্রভু! আজ্ঞা করুন, বাণিজ্য যাত্রা করিবার মানসে আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য করিয়া দ্বিগুণ লাভে ধনে প্রাণে ফিরে আসিয়া আপনার চরণ সেবা করিতে পাই। তখন শেখ হাম্মাদ বলিলেন, তোমাকে আমি এসময়ে বাণিজ্যে যাইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা

এবারকার বাণিজ্যে তোমার বহু ভয়ের কারণ আছে, যেহেতু তুমি বাণিজ্যে গমন করিলে ধনে প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, দস্যুগণ তোমার বাণিজ্য আসবাব লুণ্ঠন করিবে, তোমাকেও প্রাণে বধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, অতএব তুমি এবারকার মত ক্ষান্ত হও, বাণিজ্য করিতে যাইবার জন্য গৃহ হইতে কখনই বাহির হইওনা। তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, গুরু-বাক্য লঙ্ঘন করিও না; যখন তোমার এই মন্দ সময় শেষ হইয়া সুসময় উপস্থিত হইবে, কুগ্রহ-নক্ষত্র লোপ হইয়া সুখ তারা ভাগ্য পটে উদয় হইবে, তখন তুমি আমার অনুমতি লইয়া বাণিজ্যে গেলে লাভবান হইতে পারিবে। সদাগর আপন গুরুদেবের মুখে বাণিজ্যের অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কি উপায়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে তাহার স্থির করিতে না পারিয়া হজরত বড়পীর সাহেবের নিকটে আসিয়া, গুরুর নিষেধ বাক্য ও বাণিজ্যের অমঙ্গল বার্ত্তা যাহা ঘটিবার সম্ভব, তাহা ক্ষুণ্ণমনে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনাইয়া দিলেন। সদাগর বড় পীরের পরম ভক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। সত্য যিনি দয়ার্দ্র-হৃদয় ভক্ত-বৎসল হয়, তিনি ভক্তের কষ্ট দেখিলে, কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া

থাকিতে পারেন না। প্রিয় সদাগরের মনকষ্ট দেখিয়া, বড়পীর সাহেব তাহাকে বল্লিলেন, বৎস! আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বাণিজ্যে যাইতে পারিলেই অত্যন্ত সুখি হও; যাও বাণিজ্যে গমন কর, আর বৃথা চিন্তা করিয়া মনে কষ্ট করিও না, আমি আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর বিশ্বপালক রক্ষাকর্ত্তা তিনিই তোমাকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, সাগর সলিলে, পাহাড় পর্ব্বতে, অরণ্য জঙ্গলে যেখানেই কেন তুমি থাকনা স্বয়ং খোদাতায়ালাই তোমার মঙ্গলময় কর্ত্তা হইয়া, বিস্তর লাভবান করাইয়া দিবেন। যাও, আর কোন ভয় করিও না, তোমাকে দয়াময় খোদা-তায়ালার করে সমার্পণ করিয়া দিলাম এবং নিজে তোমার সমস্ত আপদ বিপদের ভার মস্তকে চাপাইয়া লইলাম। সদাগর বড়পীরের আশীর্ব্বাদে যারপর নাই সন্তোষ হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, পরে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি লইয়া বড় পীরের আজ্ঞামত বাণিজ্যে যাইতে শুভ যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস পরে একটী সহরে পৌঁছিয়া, একস্থানে তাঁবু ফেলিয়া আপনার মালপত্র বিক্রয় করিতে লাগিলেন। দ্বিগুণ লাভে সমুদয় মালগুলি বিক্রয় করিয়া, পুনরায় সে দেশের অন্য দ্রব্যাদি স্থানে স্থানে ক্রয় করিয়া রাখিতে লাগিলেন। পরে সেস্থান

হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে কয়েক স্থানের বেশী মুদ্রার মাল যাহা ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার ঠিকানা ভুলিয়া গেলেন। সামান্যই মাল পাইয়া সওদাগর মনকষ্টে একস্থানে রজনী যাপন করিলেন। রাত্রিকালে সয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হটাৎ একদল্ দস্যু আসিয়া সমস্ত মাল, ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং কয়েক জন দস্যু বারংবার অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া চলিয়া গেল। জাগ্রত হইলে ঐ স্বপ্নের অন্য কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না, কেবল মাত্র তাঁহার গ্রীবাদেশে একটী ক্ষতের চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইল, তাহাতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হইতেছে

সওদাগর স্বপ্ন দর্শনে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, খোদাতায়ালার শত শত ধন্যবাদ করিয়া, পুনরায় সেই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন ; খোদাতায়ালার কি অপার মহিমা সওদাগরের হারাধন পুনরায় একস্থানে দ্বিগুণ লাভে-মূলে প্রাপ্ত হইয়া গেলেন। সেই সফরে সওদাগর খোদাতায়ালার কৃপায় ও বড়পীরের দোওয়ায় দ্বিগুণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বোগদাদ সহরে ফিরিয়া আসিলেন। সওদাগর সহরের সীমানায় আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রথমে আমি গুরুদেবের নিকটে যাইয়া দেখা করিব ? না, বড়

পীরের চরণ সেবা করিয়া গৃহে গমন করিব? এইরূপ প্রকার মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়, তাঁহার গুরুদেব শেখ হাম্মাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সওদাগর হটাৎ আপন গুরুদেবের সাক্ষাত পাইয়া, তাঁহাকে সালাম দিয়া, পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া, ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শেখ হাম্মাদ সওদাগরের মনভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি বাণিজ্যে যাবার কথা বড়পীর সাহেবকে যদি না বলিতে এবং তিনি তোমার জন্য যদি আশীর্ব্বাদ না করিতেন, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মহা বিপদগ্রস্ত হইতে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভুল ছিলনা; তুমি বাণিজ্যে গমন করিলে, হজরত বড়পীর সাহেব তোমার ধন প্রাণ রক্ষার জন্য খোদাতায়ালার নিকট সত্তর বার দোয়া চাহিয়াছিলেন, তজ্জন্য দয়াময় খোদাতায়ালা বন্ধুর কথা রক্ষা করিয়া তোমার উপরে স্বপ্নযোগে সমস্ত বিপদ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তুমি ক্রয় করা দ্রব্যাদি হারা হইয়াছিলে, এবং তুমি স্বপ্ন ভঙ্গে নিজের অঙ্গে রক্ত দেখিতে পাইয়াছিলে। এখন তুমি তোমার রক্ষাকর্ত্তা খোদাতায়ালাব ধন্যবাদ দাও এবং খোদাতালার নামে দীন দুঃখী দারিদ্রদিগকে দান খায়রাত কর। সওদাগর গুরুদেবের কথায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে তাঁহার চরণে চুম্বন দিয়া, হজরত বড়পীরের নিকটে গিয়া

বাণিজ্যের ঘটনা ও গুরুদেবের বর্ণনা সকল শুনাইয়া দিলেন। হজরত বড়পীর সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, এ যাত্রায় আমার দোওয়ায় তোমার রক্ষা হইয়াছে। তোমার গুরুদেবও মহা সাধু, তাঁহার আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করিও এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইও না।

হজরত বড়পীর সাহেব খড়ম ফেকিয়া দস্যু সংহার করিয়া সওদাগরকে রক্ষা করেন তাহার বিবরণ।

সফিনাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু মহাম্মদ আব্দোল হক কুদ্দস সহর্‌হু বর্ণনা করিয়াছেন যে, সফর মাহার তৃতীয় তারিখ সোমবার দিবসে বেলা অপরাহ্নের সময়, হজরত বড়পীর সাহেব বোগদাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ে ছাত্র দিগকে শিক্ষা দিতে দিতে হটাৎ উঠিয়া ওজু করিয়া উপাসনা সমাপ্ত করতঃ উচ্চৈঃস্বরে "ইল্লাল্লাহ্" বলিয়া একটী শব্দ করিয়া পাদুকা দুখানি ক্রোধান্বিত হইয়া ফেকিয়া দিলেন; সেই পাদুকা দুইটী দেখিতে দেখিতে কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। যে সময় তিনি পাদুকা দুখানি স্ববলে নিক্ষেপ করিয়া-

ছিলেন, সে সময় তাঁহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে থর থর করিতেছে, সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিলে মহা বীর্য্যবন্ত পুরুষকেও ভয়ে ভীত হইতে হয়; এমন কেহ বলিষ্ঠ পুরুষ নাই যে, সে সময় তাঁহার সঙ্গে একটী কথা কয়। সেই দিবস হইতে এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে গমন করিতে মহান হৃদয় বলিষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনিও ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেন। যখন একটী মাস গত হইয়া গেল, তখন একদল বণিক বোগদাদ সহরে আসিয়া পৌঁছিল। সেই বণিকদল হইতে একজন যুবক সওদাগর কয়েকটী স্বর্ণ মোহর, আসরফি, কয়েকটী কিম্মতি প্রস্তর, এয়াকুত, ভাল ভাল রেসমের থান ও ভাল ভাল মেওয়া ফল ভৃত্যের মস্তকে দিয়া পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনারা পীর সাহেবকে এই সংবাদ দিন, যে আপনার আশ্রিত একজন সওদাগর আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছে। কেহ গিয়া পীর সাহেবকে সংবাদ দিতে, তিনি তখনই পূর্ণ কুটীর হইতে বাহির হইয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন। তখনই সওদাগর সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া, খড়ম দুখানি পার্শ্বে ধরিয়া, তাঁহার যুগল চরণ চুম্বন করিল। হজরত তাহাকে সমাদরে নিজের কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই খড়ম দুখানি তুমি কোথায় পাইলে? বণিক-তনয় অভিবাদন পূর্ব্বক

আদবের সঙ্গে বলিতে আরম্ভ করিল, হুজুর! আমি বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতঃ পথি মধ্যে আসিতে আসিতে একস্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম; সেইদিন সফর মাসের তৃতীয় তারিখ সোমবার দিবস ছিল। হটাৎ একদল দস্যু আসিয়া আমার লোকজনকে মারিয়া ধরিয়া, মাল আসবাব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দস্যুর অত্যাচারে তরবারীর প্রহারে রক্তস্রোতে প্রান্তর লালবর্ণ হইয়া গেল, আহত ব্যক্তির চীৎকারে আমার প্রাণ শতধার বিদীর্ণ হইল, সেই লোম-হর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হইলে, এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে। সেই ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, একমনে, একধ্যানে ভব-ভয় নিবারণকারী, বিপদ বিনাশকারী সর্ব্বময় কর্ত্তা খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে একবার, একবার, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে ছিলাম; এমন সময় দৈব একটী শব্দ শুনিতে পাইলাম, সেই ভীমরবে সমুদয় প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল, ভুমিকম্পের ন্যায় যেন সেই মরু প্রান্তর টলমল করিতে রহিল, দস্যুদল প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কে কোথায় পলায়ণ করিল, দেখিতে দেখিতে লুণ্ঠিত স্থানে শান্তিবারি বর্ষণ হইয়া শান্তি মূর্ত্তি ধাবণ করিল। দস্যুদল কে কোথায় লুকাইল

যে, তাহা বুঝিবার বা জানিবার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। মরু প্রান্তর নীরব, নিঃশব্দ; এমন সময় আবার বন জঙ্গল দিকে চীৎকার ধ্বনি হইতে লাগিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর"। দেখিতে দেখিতে ক্রমান্বয়ে চীৎকার ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইলে লক্ষ্য কবিয়া দেখি যে, কয়েক জন তস্কর আসিয়া বলিতেছে, সওদাগর সাহেব! রক্ষা করুন!! রক্ষা করুন!!! আপনাব লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়া নিন। আমাদিগকে প্রাণে বাঁচান আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে দস্যুপতি মারা পড়িয়াছে, ভীষণ পাদুকা প্রহারে আর কাহার নিস্তার নাই, ম'লাম! ম'লাম!! পায়ে ধরি এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন, যেমন কর্ম্ম তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন আমি ভরসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি যে, দস্যুপতিদ্বয় খড়মাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নরক-গামী হইয়াছে এবং এই দুইটী খড়ম দৈববলে যে দস্যু-দিগকে আঘাত করিতেছিল তাহা তখনই থামিয়া গেল। আমি আপনার পাদুকা দুইটী চিনিতে পারিয়া হস্তে কবিয়া তুলিয়া লইলাম, নিজের মাল আসবাব সকলই বুঝিয়া পাইলাম এবং সেই সকল দস্যুগণও দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, আমার সমভিব্যাহারে আপনার কাছে মুরিদ হইতে আসিয়াছে। হজরত বড়পীর সাহেব তখনই তাহাদিগকে ডাকিয়া মুরিদ করিয়া সকলকে বিদায়

করিয়া দিলেন। বড়পীর সাহেবের এই আশ্চর্য্য কেরামতে সকলেই অবাক হইয়া গেল।

একটী রমণীর সতীত্ব রক্ষা হয় তাহার বিবরণ।

খোলাসাতল মোফাখারিন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, উমর বজাজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বোগদাদ নগর মধ্যে একটী ষোড়শবর্ষীয়া রমণী পরমাসুন্দরী ছিল, তাহার রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়া থাকে, সেই যুবতী রমণীর সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় কতই লোকের মন চাঞ্চল্য ভাব ধারণ করিত। পুরুষের পক্ষে রমণীরত্ন কতই যে রমণীয় বস্তু তাহা লেখকের সাধ্যাতীত। বসন্তকালে উদ্যান মধ্যে একটী বৃক্ষে প্রস্ফুটিত গোলাপফুল হেলা দোলা করিলে যেমন দেখিতে সুন্দর হয় এবং যাহার দৃশ্য সেই গোলাপের উপর পতিত হয়, তাহারই মন চঞ্চল হইয়া গোলাপের সুগন্ধি লইতে ইচ্ছা করে। একটী লম্পটের চক্ষে সেই সাধ্বী সতী রমণীর সৌন্দর্য্য তদ্রূপ প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু ঐ রমণী হজরত বড়পীরের নিকট মুরিদ হইয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিত, কথন

কু-অভিপ্রায় অন্তরের মধ্যে স্থান দিত না। কিন্তু একটী লোক তাহার ভুবনমোহন রূপের ফাঁদে পড়িয়া যাতনায় অস্থির হইয়া বেড়াইত। এরূপ দুই তিন বৎসর রমণীর প্রতি আশক্ত হইয়া তাহার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইত। একদিন ঐ রূপবতী সতী রমণী কোন কার্য্য বশতঃ একটু অদূরে নির্জ্জন বনের ধার দিয়া কোথায় যাইতেছিল। সেই দুষ্টা পূর্ব্ব হইতে সন্ধান লইয়া আপনার কু-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য ঐ বনের ধারে একটী গর্ত্তে লুকাইত ছিল। নির্জ্জন স্থানে স্ত্রীলোকটীকে একাকী নিকটে পাইয়া, তাহার অমূল্য রত্ন সতীত্বধর্ম্ম নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। লম্পটের হাতে পড়িয়া সতী নারী একবারেই নিরূপায় হইয়া পড়িল। নিকটে লোকজন নাই যে, কাহাকেও চীৎকার করিয়া ডাকে। সেই নির্জ্জন স্থানে চীৎকার করিলে খোদাতায়ালা ব্যতীত কেইবা শুনে। তখন আর কোন অন্য উপায় না দেখিয়া, সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে অন্তর্য্যামী দাতা দয়ালু খোদাতায়ালাকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিল। আর উচ্চৈঃস্বরে মুখে আপন গুরুদেব বড়পীর সাহেবকে ডাকিতে রহিল, হে ধর্ম্মের গুরু! বড়পীর সাহেব! আমাকে এই দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ লম্পটের হস্ত হইতে রক্ষা

করুন। সতীত্বধর্ম্ম নাশ পায়, নিরূপায়, অসহায়, অবলা-বালাকে, নির্জ্জনালয় হইতে উদ্ধার করিয়া লউন। নতুবা আমার সতীত্বে কলঙ্ক এবং তোমার পীর দস্তগীর নামে কলঙ্ক হইবে (১)।

"ইয়া গওসল আজম! আল্‌গায়াসো, আল্‌গায়াসো।" হে গওসল আজম। তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমাকে রক্ষা কর। যে সময় সতী রমণী বিপদে পড়িয়া হজরত গওসল আজমকে ডাকিতে ছিলেন সে সময় তিনি ওজু করিতেছিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় বদন হইতে যেন অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল, ভক্তের বিপদ বুঝিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাম পদের একটী জুতা খুলিয়া স্ববলে বনের দিকে ছুটিয়া সেই লম্পটের মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিলেন। পাদুকাটী তীরের ন্যায় গিয়া পাপীষ্ঠের মাথার উপর বার বার প্রহার করিতে লাগিল। বারবার জুতার ভীষণ আঘাতে দুষ্ট লম্পটের, মস্তকের খুলী ভাঙ্গিয়া চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল এবং সেই দণ্ডেই পাপাত্মার পাপাকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিতে গিয়া, জুতার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া নরকগামী হইয়া গেল।

(১) পীরদস্তগীর, অর্থাৎ যে পীরের হস্তগত খোদাতায়ালা স্বয়ং হইয়া থাকে, তাঁহাকে পীর দস্তগীর বলে।

পরে ঐ সতী রমণী দয়াময় খোদাতায়ালাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া, বড়পীরের কেরামত বুঝিয়া, তাঁহার পাদুকাটী হস্তে লইয়া হজরত বড়পীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার সকল ঘটনাগুলি একে একে খুলিয়া বলিল এবং সেইদিন হইতে সেই সতীনারী পীরের পদে মতি গতি রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

গুরুপদে মতি গতি আছয়ে যাঁহার।
ইহকালে পরকালে অভাব কি তাঁর॥

বড়পীর সাহেবের নিকট হইতে দোওয়া শিখিয়া দৈত্য-পতিকে আনয়ন করিয়া একটী লম্পট দৈত্যের প্রাণবধ করিবার বিবরণ।

জোব্দাতল আবরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু সৈয়দ আব্দোল্লা বেন আহাম্মদ বোগদাদি তিনি বলিয়াছেন যে, একদিন রাত্রিকালে, আমার একটী পরম সুন্দরী পঞ্চদশ বয়স্কা কন্যা অকস্মাৎ শয্যা হইতে কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া জানিতে পারিলাম। তৎপরে কন্যার অন্বেষণে দিগদিগান্তরে লোক পাঠাইলাম; নিজেও নিকটবর্ত্তী

পল্লীগ্রাম ও প্রতিবাসীগণের বাড়ী ও বাগান, উদ্যান, মাঠ, ময়দান, বন জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইবার কারণে হতাশ হৃদয়ে, সন্ধ্যার সময়ে হজরত বড়পীর সাহেবের নিকটে গিয়া আদ্য অন্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া দিলাম। হজরত বড়পীর সাহেব আমার এই অকস্মাৎ বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই মনস্তাপ করিতে লাগিলেন; পরে আমাকে এই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিলেন। "শেখ আব্দোল কাদের জ্বিলানি শাইয়ান লিল্লাহে" ইহার পরে আমাকে বলিলেন,, তুমি উক্ত মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া ঐ অঙ্গুলীর দ্বারায় মৃত্তিকার মধ্যে চতুষ্কোণা একটী রেখা টানিয়া ঘর কাটিবে এবং ঐ রেখার ভিতরে বসিয়া তিন শত ষাট বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। সামান্য রাত্রির পরেই দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই সকল দৈত্যগণ তোমাকে ভয় দেখাইতে নানারূপ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তিতে তোমার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, প্রায় সমস্ত রজনী দৈত্যগণ ব্যাঘ্র হিংস্রক জন্তুরূপে, কখন কখন অজাগর সর্পরূপে, ভয় দেখাইয়া তোমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। সাবধান। তাহাতে তুমি ভয় না করিয়া নির্ভয় অন্তরে এক মনে গণ্ডির ভিতরে

বসিয়া থাকিবে। রজনীব শেষে স্বয়ং দৈত্যপতি বাদসাহ্ সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তুমি যোড় হস্তে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিবে। তোমার প্রতি দৈত্যরাজের দৃষ্টি পড়িলে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, রে মানব। কে তোমাকে এথানে পাঠাইল? তখন তুমি তাঁহাকে বলিবে হজবত আব্দোল কাদের জিলানি পাঠাইয়াছেন। পুনরায় তোমাকে বলিবে কি চাও? তখন তুমি নিজের বক্তব্য বলিও। সাবধান এই কার্য্যটী নির্জ্জন স্থানে একাকী একটী প্রান্তর মধ্যে সমাধা করিও। আমি তখনই পীর সাহেবকে সালাম করিয়া বিদায় হইলাম, পরে একটু রাত্র বেশী হইতেই একটী জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে আসিয়া, পীর সাহেবের আদেশ মত মন্ত্র পাঠ করিয়া রেখা টানিয়া বসিলাম। তিনশত যাটবার মন্ত্র পাঠ করিবার পরেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সেই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া পিপাসায় প্রাণ শুষ্ক হইয়া গেল, তথাপি সাহসে নির্ভর কবিয়া গণ্ডির মধ্যে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু উপসর্গ ও দুর্বৃত্ত-দৈত্য গণের এমন কাহার ক্ষমতা নাই যে আমার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহারা গণ্ডির অদূরে থাকিয়া আমাকে নানা প্রকারের ভয় দেখাইতে কোন প্রকার

ত্রুটি করে নাই। আমি সে সময় কোন্ দিকে না তাকাইয়া হেট মুণ্ডে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় দৈত্যরাজ অশ্বারোহণে সৈন্য সামন্ত সহ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখন দৈত্যরাজ আমাকে বলিলেন, কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছ? আমি কহিলাম হজরত কোতবে-আলম, গওসল আজম, মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাঁদের জিলানি তিনিই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে কারণ তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাও আপনাকে জানাইতেছি। আমার একটী যুবতী সুন্দরী কন্যা রাত্রে মধ্যে কোথায় যে, অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানে অন্বেষণ করিয়াছি কিন্তু কোনস্থানেই কন্যার সন্ধান পাইলাম না। আপনি এখন দৈত্য দ্বারা তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দিলে, তবে আমি স্নেহের তনয়ার মুখ দেখিয়া তাপিত হৃদয় সুশীতল করি।

দৈত্যপতি হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেবের নাম শ্রবণ করিবামাত্র অশ্ব হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া হজরত বড়পীরেব সম্মান স্বরূপ উঁহার নামের অঙ্কিত রেখা-টীতে বারবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৈত্যরাজ

দণ্ডায়মান হইয়া আরক্তলোচনে দৈত্য দিগকে আদেশ করিলেন, যাও তোমরা শীঘ্র যাও, দেশ দেশান্তরে সেই দুষ্টের অন্বেষণে গমন কর। যেখানে তাহাকে পাইবে সেই খানেই বন্ধন করিয়া উহার কন্যাসহ লইয়া আসিবে। রাজ আজ্ঞা পাওয়া মাত্রেই দৈত্যগণ দিগদিগান্তরে গমন করিল এবং দণ্ডেক মধ্যেই সেই দুরাচারকে বান্ধিয়া আনিল, তৎসঙ্গে আমার কন্যাও আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন দৈত্যদুত যোড় হস্তে বাদসাহকে কহিতে লাগিল, হুজুর! এই দুর্ম্মতি দৈত্যাধমের চীন দেশে বাস, সর্ব্বদাই এইরূপ প্রকারে দুষ্টামী করিয়া মানবগণকে কষ্ট দিয়া থাকে। এখন হুজুরের যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন। তখন দৈত্য-রাজ দুষ্ট জেনের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, রে দৈত্যাধম! এই ব্যক্তির কন্যাকে কেন অপহরণ করিয়া লইয়াছিলি? হজরত বড়পীরের ভয় কি তোর একটুও হইল না। দুষ্টমতি জেন কহিল, হুজুর! ঐ স্ত্রীলোকটীর জন্মদিন হইতেই উহার প্রতি আমি আশক্ত আছি; যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া, উহাকে শয়ন গৃহ হইতে লইয়া গিয়াছিলাম। দৈত্যরাজ আর সময় নষ্ট না করিয়া তখনই দুষ্টের শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। দেখিতে দেখিতে দুষ্টের মস্তক ঘাতকের অসিঘাতে ধূলায় লুণ্ঠিত হইল।

দৈত্যরাজ আমার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, বিদায় হইবার ইচ্ছা করিলে, সে সময় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! আপনি দৈত্যপতি হইয়া বড়পীর সাহেবের আজ্ঞা কি জন্যই বা পালন করিয়া থাকেন? তখন তিনি বলিলেন, তাঁহার আজ্ঞা পালনে কেন বাধ্য না হইব? যখন বড়পীর সাহেব মহাযোগ সাধনে বসিয়া ভূমণ্ডলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, তখন আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সমুদয় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিশ্বপালক খোদাতায়ালা তঁহাকে এমন ক্ষমতা দান করিয়াছেন যে, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, রাজা ও প্রজা সকলকেই বড়পীরের আজ্ঞা পালনে বাধ্য হইতে হইবে, নতুবা কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই;

বিশ্বপতির আজ্ঞাবহ হয় যেইজন।
তাঁর আজ্ঞা সাবধানে করে সে পালন॥

বড়পীরের আজ্ঞায় কুমরীপাখি কথাকয় আর পায়রাতে ডিম দেয়, তাহার বিবরণ।

মনাকব গওসিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মনসা- সেখ বলিয়াছেন যে, একদিন শিব দস্তগীর রৌসন জমির

আহম্মদের পুত্র আবুল্ হোসেনের বাটীতে ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হন। তিনি হজরত বড়পীর সাহেবকে আসন দিয়া অতি যত্নসহকারে বসাইলেন। অনেক কথোপকথনের পরে যখন হজরত উঠিয়া যাইবার জন্য খাড়া হইলেন, সে সময় আবুল হোসেন কর যোড়ে বড় পীরের নিকট কহিল, হুজুর পীর রৌসন জমির। আমি একটী কুমরী পাখি পুষিয়াছি, আর এক জোড়া পায়রা ঘরে রাখিয়াছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কুমরী পাখিতেও বুলি বলে না এবং পায়রাতেও ডিম পাড়েনা, কেবল আমার কষ্ট করাই বৃথা হইতেছে। ইহা শুনিয়া হজরত গওসল আজম, পায়রার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এলফাগ লে মালেকা" এ, পায়রা! তুমি তোমার প্রতিপালক-কর্ত্তার জন্য কেন ডিম পাড়িয়া উপকার করনাই? যে হেতু তোমার কর্ত্তা, তোমার বংশাবলি বাচ্ছার দ্বারায় লাভবান হইতে পারিবে। পরে কুমরী পক্ষিটীকে বলিলেন, "সাব্বেহ্ লেখালেকেকা" আয় কুমরী! আজ্ঞা-পালন কর তুমি, তোমার রব্বের। বড়পীর সাহেবের আজ্ঞায় সেই দিন হইতে পায়রা ডিম পাড়িতে ও কুমারী কথা বলিতে আরম্ভ করিল। হজরত বড়পীরের পদার্পণে আবুহোসেনের এই একটী মহা উপকার সাধিত হইয়াছিল।

বড়পীর সাহেবের ভৃত্য সর্পরূপী জ্বেন হত্যা করিয়া বন্দি হয় তাহার বিবরণ।

লাতায়েফ গরায়েব নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত খাজামইনদ্দিন রহমাতুল্লা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম। কতদূর যাইতে যাইতে একটী মনোহর উদ্যান দেখিয়া, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সেই উদ্যানটী অতি মনোহর, নানারূপ ফল ফুলে শোভা করিয়াছে, কোন স্থানে খঞ্জন খঞ্জনি, ময়ুর ময়ুরী আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে ভ্রমরাতে গুঞ্জন স্বরে, গোলাপ, বেল, চামেলি, জুই, চাঁপা, পদ্ম ফুলের মধু পান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। কখন কখন বসন্তের সুশীতল সমীরণ আসিয়া মন প্রাণ উদাস করিয়া তুলিতেছে, আবার তামালের ডালে বসিয়া কাল কোকিল কুহু কুহু রবে কেমন সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া, মন প্রাণ বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা সেই উদ্যানে বসিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। এমন সময় বড়পীর

সাহেবের প্রিয়ভৃত্য, আমার পরম বন্ধু একটী সর্প দেখিয়া তাড়াতাড়ি যষ্টির আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। সেই কালকূট সর্পটীকে হত্যা করিয়া, আমাদের দিকে তিনি ফিরিয়া আসিবেন কি, অমনি দেখিতে দেখিতে সমস্ত উদ্যানটী অন্ধকার ময় হইয়া গেল, এমন কি উদ্যানের একটী বস্তু মাত্রও দৃষ্টি গোচর হইল না, সকলই অন্ধকারময়। অকস্মাৎ ঝড়, তুফান, ঝন্‌ঝাবত প্রবল ঝটিকা বহিয়া ক্ষণেকের মধ্যেই যেন, প্রলয়কাল সংঘটন করিয়া দিল। সে সময় কি করিব, কোথায় যাইব, কেমনে রক্ষা পাইব, যে তাহাও কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিধির কৃপায় সে দুর্য্যোগ আর অধিকক্ষণ স্থায়ী থাকিল না, দেখিতে দেখিতে উদ্যান মধ্যে শান্তি দেবী আসিয়া দেখা দিল, ঝড়বায়ু, গভীর গর্জ্জন, ঘোর অন্ধকার সকলি চলিয়া গেল। স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু বড়পীর সাহেবের সেই প্রিয় ভৃত্য আমার পরম বন্ধুকে আর দেখিতে পাইলাম না। হায়! গ্রহ নক্ষত্র দোষে বন্ধু যে, আমার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাও আর স্থির করিতে পারিলাম না। আমরাও তাহাকে উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না। বন্ধু-বিচ্ছেদে মনকষ্টে কতই কি চিন্তা করিতে লাগিলাম কিন্তু ভাগ্যদোষে

কিছুই ফলদয় হইল না; অবশেষে নিরুপায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে সেই উদ্যান মধ্যেই বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাদুই পরে বনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, বন্ধু আমার বনের দিক হইতে রাজবেশ পরিধান করিয়া, সাহানা টুপি মস্তকে দিয়া, আমাদের কাছে উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই বল্‌ছি, বন্ধুর আমার সে ভাব, সে পরিচ্ছদ দর্শন করিলে, প্রাণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রিয় বন্ধু দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, আমার গলা বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিচ্ছেদের পর সম্মিলনের কান্না, কত যে মধুর। তাহা কে বুঝিতে পারে, সম্মিলনের কতই যে মাধুর্য্য, তাহা কে জানিতে পারে, যিনি বিচ্ছেদের পর মিলন করিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারেন। দুঃখের পর যিনি সুখি হইয়াছেন, তিনিই সুখের আস্বাদন বুঝিয়া থাকেন। যিনি দারিদ্রতার পর ধনবান হন, তিনিই ধনের গৌরব বুঝিতে সক্ষম হন। পাঠকগণ! আজ সেইরূপ ভাবে দুই বন্ধুতে সম্মিলনের কান্নার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। অনেক কান্নার পর, খাজামইনদ্দিন রহমাতুল্লা আলায়হে বন্ধুকে বলিলেন, বন্ধু! আপনি সর্প সংহার করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন এবং এই রাজ পরিচ্ছদই বা কোথায় পাইলেন? তিনি বলিলেন,

ভাই! আমি যখন সর্প সংহার করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সেই স্থান হইতে ধুম নির্গত হইয়া সমস্ত উদ্যান অন্ধকার হইল, প্রবল ঝড় তুফানে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, এমন সময়ে সেই অন্ধকার মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আসিয়া আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। সেই দণ্ডেই আমাকে একটী অট্টালিকার মধ্যে লইয়া উপস্থিত করিল। আমি সেই বন্ধনাবস্থায় দেখিতে পাইলাম যে, স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে একজন দৈত্যরাজ উন্মোচিত তীক্ষ্ণধার তরবারী হস্তে, আরক্তলোচনে বসিয়াছেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে একটী মৃতদেহ রক্তাক্ত শরীরে পড়িয়া আছে। সেই দৈত্যরাজ যে সময়ে এক একবার মৃত দেহের দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছেন, এমন বোধ হয়, যেন তাঁহার চক্ষের জলে নদীর স্রোতের ন্যায় ধরাতল ভাসিয়া যাইতেছে। আবার যখন তাঁহার ঐ চক্ষু হইতে ফোটা ফোটা জল পড়িয়া থাকে, তখন এমন বোধ হয় কি ঐ চক্ষের জলেই বা আজ সমুদয় জগত জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়। দৈত্য রাজের সে চাহনি দেখিলে পরে বীর পুরুষগণ ও ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। যখন আমাকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল, তখন তিনি তরবারী দেখাইয়া কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়, ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রে মানব তনয়! বিনা কারণে

বা বিনা অপরাধে আমার এই পুত্রটীকে কেন বাগান মধ্যে হত্যা করিয়াছ? অকারণ একটী লোককে খুন করিতে তোমার প্রাণে একটু কি দয়া মায়া হইল না? তখন আমি কহিলাম, হে দৈত্য-অধিপতি মহারাজ! আমি কখনই কাহাকে খুন করি নাই, আমা হইতে এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কখনই হয় নাই। আমার কথার শেষ হইতে না হইতেই দৈত্যরাজ কহিলেন, রে মানবকুল! নিশ্চয় তুমি আমার সন্তানকে খুন করিয়াছ। ঐ তোমার দণ্ডাঘাতে উহার মস্তক চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এখনও তোমার হস্তস্থিত যষ্টি রক্ত মাখা মৃতের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। সাবধান! মিথ্যা কথা কহিলে তোমার আজ আমার করে কিছুতেই রক্ষা নাই, পুত্র হন্তার প্রতিশোধ এখনই লইব। তখন আমি সাহসে নির্ভর করিয়া কহিলাম, ধর্ম্মঅবতার দৈত্য-পতি! কখনই আমি মানব কি দানব কে হত্যা করি নাই, তবে একটী কালসর্প হত্যা করিয়াছি, এই মাত্র সঠিক পরিচয় দিলাম। আবার ভীমরবে কহিলেন, রে নামাকুল হিংসাতুর মানব তনয়! বিনা কারণে সর্প সংহার করা এই বা কোন বিধি। তখন আমি তাঁহাকে এই হাদিসটী পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলাম।

"কাতলোল মুজি কাবলাল ইজা।"

অর্থাৎ আমাদের পয়গম্বর হজরৎ মহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন, হিংস্রক জানোয়ার কষ্ট দিবার পূর্ব্বেই তাহাকে সংহার কর। আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী সর্পটীকে হত্যা করিয়াছি। ইহার জন্য হত্যাকারীর কোন শাস্তি হইতে পারে না, আমিত আর আপনার পুত্রকে হত্যা করি নাই, যে তজ্জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন। তখন দৈত্যপতি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, রে নামাকুল হিংসাজীবি. কালসর্প রূপী ঐ আমার পুত্র, উদ্যান মধ্যে শীকার করিতেছিল, তোমাদিগকে দেখিয়া লতার মধ্যে লুক্কাইত হইবে কি অমনি তুমি আমার স্নেহের পুত্রকে হত্যা করিয়া বসিলে, আবার বল আমি কোন দোষে দোষী নই; এখনই তোমাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া প্রাণে বধ করিব। এই বলিয়া কাজীকে ডাকিয়া কহিলেন, এই মানব-তনয়, অকারণে আমার পুত্রকে খুন করিয়া মারিয়াছে, এখন উহার জন্য বিচার মত যাহা শাস্তি হয় তাহাই করুন। বিচার পতি কাজী দুই জনের জবানবন্দী লইয়া, হত্যাকারীকে ভালরূপ দেখিয়া, দণ্ডাঘাতের পরীক্ষা পাইয়া, আমাকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়া, অসির প্রহারে প্রাণবধ করিতে বাদসার প্রতি আদেশ করিলেন। বাদসা তখনই ঘাতক জাল্লাদকে ডাকিয়া বধ্য ভূমিতে আমার প্রাণ বধ করিবার জন্য

আদেশ করিলেন। ঘাতক দৈত্যরাজের আজ্ঞায়, আমাকে হত্যা করিবার জন্য যখন বধ্য ভূমিতে আনিয়া হাজির করিল, সে সময় জীবন রক্ষায় নিরুপায় হইয়া, মনে মনে বড়পীর সাহেবকে ডাকিতে লাগিলাম।

বধ্য ভূমিতে ঘাতকের হাতে শানিত কৃপাণ দেখিলে, কার না প্রাণে ভয় হয়। আজ যাহাকে বধ করিবার জন্য শ্মশান মধ্যে ঘাতকে লইয়া আসিয়াছে, পাঠক বলুন দেখি তার প্রাণে আজ কত ভয়? একদিকে ভয়, ত্রাস, মৃত্যু নিদর্শন তরবারীর চাকচিক্য দর্শন; অন্য দিকে পুত্র পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের মায়া, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যাথা, শাসন, পীড়ন, উৎপীড়ন, আবার নানা প্রকার ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সয়তানের চাতুরী, প্রাণ রক্ষার উপায়, এমন সময় জগতে কে নিশ্চিন্ত বা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? দৈত্যরাজের কঠোর আজ্ঞায়, প্রাণ সংহার সময়, একবারেই কাষ্ঠ পুত্তলীকাবত নির্ব্বাক, নিশ্চল, নিস্তেজ হইয়া একবার মাত্র, সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিলেন; পরক্ষণেই বড়পীরের কৃপা, স্নেহ, দয়া, মায়া মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, আবার, বলিলেন, হে বড়পীর গুণধর! জন্মের মতন বিদায় হই। আর আপনার চরণ সেবা ও আজ্ঞা-পালন করিতে পারিব না, আর ভক্তিভরে সুধামাখা গওসল

আজম নাম ডাকিতে পাবনা; হায় হায়! বিদেশে পড়িয়া জীবন হারাই! আপনিও আপনার স্মরণাগতের মরণ আসিয়া দেখিলেন না, এখন জ্বরাজীর্ণ দুঃখশোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জন্মের মত জগত হইতে বিদায় হইলাম। এই বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িব কি, ঘাতকেও প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময় বেগে অশ্ব ছোটাইয়া একজন বীর পুরুষ আসিয়া তরবারী ঘাতে ঘাতকের প্রাণ সংহার করতঃ একটী শব্দ করিলেন, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, দৈত্যপুরী যেন, রসাতল গামী হইল, দৈত্যরাজ সিংহাসন হইতে ভূতলে পড়িলে চতুর্দ্দিকে হায় হায় শব্দ হইতেছিল। এমন সময় দৈত্যরাজ আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আমাকে কহিল, আপনি কে তাহা সত্য করিয়া বলুন। তখন আমি কহিলাম, মহবুবে সোবহানী আব্দোল কাদের জ্বিলানি বড়পীর সাহেবের খেদমতগার দৈত্যরাজ হজরত বড়পীরের নাম শুনিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি না বুঝিয়া অজ্ঞাত বশতঃ পুত্রশোকে জ্ঞান হারাইয়া আপনাকে বধ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম; এখন আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, আপনিও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করুন। এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমার শিরে সাহানাতাজ অর্থাৎ রাজ মুকুট ও রাজ পরিচ্ছদ

পরাইয়া দিলেন। আর যিনি আমাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে আদেশ করিলেন, তুমি উহাঁকে সেই উদ্যান মধ্যে রাখিয়া আইস। আমি আসিবারকালে বাদসাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি দৈত্য-পতি হইয়া কেন মানব-তনয় বড়পীরের নামে ভীত হন এবং তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন? তখন তিনি আমাকে বলিলেন, যখন হজরত বড়পীর সাহেব ধ্যানে বসিয়া আরশেরদিকে তাকাইয়া দেখেন, তখন জগতের দেব, দানব, মানব ও দৈত্য ইত্যাদি সকলই উহাঁর জ্যোতির্ম্ময় তেজে ভয়ে ভীত হইয়া থর থর কাঁপিতে থাকে, এমন কি আকাশ ও পাতাল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। নতুবা এ জীবনে আর আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত না।

দৈব-হস্ত, শয়তানকে প্রহার করে তাহার বিবরণ।

মাল্লাফুজ গিয়াসি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আহাম্মদ বেনে সালে জিলানি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হজরত পীরদস্তগীর মহবুবে সোবহানি রাহমাতুল্লা আলায়হে, মনছুর নামক জামে মসজিদে উপাসনা করিবার

জন্য যাইতে ছিলেন, অকস্মাৎ পথিমধ্যে একটী খর্ব্বকায় পুরুষ আসিয়া, হজরতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল। আপনি আমাকে চেনেন না? আমি পাপ-পুরুষ শয়তান। আপনার ও আপনার শিষ্যগণের পরম শত্রু। আপনি আমাকে ও আমার সহচর দিগকে বড়ই কষ্টে রাখিয়াছেন। এমন কি আমার যে দর্পের সহিত ডঙ্কা চলিতেছিল তাহা আপনি চালাইতে দেন নাই, আমাকে একেবারেই অধঃপতনে দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আচ্ছা! ভাল, দেখা যাক কিরূপে আপনি আমাকে নির্য্যাতন করিতে পারেন, আমিও আপনার এবং আপনার শিষ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে রহিলাম, একটু দাঁও ঘাত পাইলেই ধ্বংশ করিয়া ছাড়িব, যেমন আদি পুরুষ হজরত আদম (আঃ) কে স্বর্গ ছাড়াইয়া তিন শত বৎসর পথে পথে কাঁদাইয়া ছিলাম। তদ্রূপ আপনাকেও করিব। তখন বড়পীর সাহেব রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, সাবধান দুরাত্মা! মুখ সামলে কথা ক, নতুবা শাস্তি দিয়া ছাড়িব, এখন বল্‌চি সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা। পাপমতি পাপাশয় শয়তান মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, পীর সাহেবের কথা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় অদৃশ্য হইতে একটী দৈব-হস্ত আসিয়া শয়তানের দুই গণ্ডে প্রহার করিতে লাগিল। শয়তান সেই প্রহারের

জ্বালায় অস্থির হইয়া চাৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। আর একদিন বড়পীর সাহেব আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় পাপাত্মর শয়তান বর্ষা হস্তে হজরতকে হত্যা করিবার মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনই অদৃশ্য হইতে একটী বীর পুরুষ তরবারী হস্তে শয়তানের সম্মুখে আসিয়া, পাপাত্মাকে সেই শাণিত অসি উত্তোলন করিয়া দেখাইল (১)। পাপপুরুষ শয়তান, শাণিত কৃপাণের চাকচিক্য দেখিয়াই, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া জীবন বাঁচাইয়া লইল। তৃতীয় দিনে—হজরত পীর সাহেব পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, শয়তান নিজের মুখে ধূলা ও কালি মাখিয়া বলিতেছে, হে আব্দোল কাদের! তুমি আমার এমন অবস্থা করিলে যে দুর্দ্দশার শেষ হইল না, আমাকে হীন অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতে হইল। তখন বড়পীর সাহেব বলিলেন, রে শয়তান! তোর আবার মঙ্গল কোথায়? ইন্‌শাল্লাহ্! তোকে এই হীন অবস্থা-তেই কাটাইতে হইবে। হীন আজহার বলেন, পাপীর শাস্তি যদি না হইত, তাহা হইলে এ জগত পাপেই পরিপূর্ণ হইত।

(১) দৈব-হস্ত, দৈব-পুরুষ, ঐটী বড়পীর সাহেবের পুণ্যাহ।

বড়পীর সাহেবের দোওয়ায় ডুবো তরি—বরকন্যা যাত্রিসহ জীবিত হয় তাহার বিবরণ।

খোলাছাতল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন পীর দস্তগীর ভ্রমণ করিতে করিতে নদীর তীরে যাইয়া দেখিলেন যে, সেখানকার প্রতিবাসী রমণীগণ কল্সী করিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহার মধ্যে একটী অর্দ্ধ বয়সী স্ত্রীলোক জলপূর্ণ কল্সী রাখিয়া নদীর তীরে বসিয়া, জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! তাঁহার সেই করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, নদীর মৎস্য পর্য্যন্ত তাঁহার শোকে শোকাতুর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার সেই করুণ স্বরে, বনের পশু পক্ষীগণও রোদন করিয়া থাকে এবং বৃক্ষের পল্লব পর্য্যন্ত স্খলিত হইতে লাগিল। পুত্র শোকাতুরা বৃদ্ধার ক্রন্দনে নদীর তরঙ্গ কল্ কল্ শব্দে তাঁহার কাণের কাছে আসিয়া যেন, তাঁহার কান্নার সঙ্গে যোগ দিল, সে সময় বৃদ্ধার শোকের-নদী একবারেই উথলিয়া উঠিল। বাৎসল্য স্নেহ-ডোর সংযোগে যেন, তাঁহার মরমে মরমে, শিরায় শিরায়,

আকর্ষণ করিতে লাগিল। হায় রে, পুত্রস্নেহ! তোমার কি মধুরতাময় আকর্ষণী শক্তি! শত সহস্র যোজন দূরে থাকিলেও তোমার আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়া হৃদয় দগ্ধে দগ্ধ হইতে থাকে; যেমন চিনের দেশলাই টানিলেই আগুণ জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ প্রায় মৃত পুত্রের কথা মনে পড়িলেই হৃদয়ের অনল প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে। বৃদ্ধার করুণ রোদন শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয় যার, তাহারও প্রাণ বিগলিত হয়; বড়পীর সাহেব কি আর সে রোদন শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারেন। একেত তিনি দয়ার সাগর, গুণের আধার, বুড়ীর ক্রন্দন হিল্লোলে একবারেই অধীরা হইয়া পড়িলেন। আর থাকিতে না পারিয়া একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিতে পার ঐ বুড়ীর কি হইয়াছে, এবং কেনই বা এমন করিয়া নদীর ঘাটে রোদন করিতেছে? সেই লোকটী কহিল, হুজুর! ঐ বুড়ীর দশা হজরত এয়াকুব আলায়হেচ্ছালামের চেয়েও অধিক চিন্তা, শোক, তাপ, দুঃখ। তিনি যেমন ইউসুফ আলায়হেচ্ছালামকে হারা হইয়া হা ইউসুফ! হা ইউসুফ! করিয়া দিবা রাত্র পুত্রশোকে কাতর হইয়া বেড়াইতেন; এই বৃদ্ধাটী তেমনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া দিন রাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহার

দুঃখের কথা শুনিলে, পাষাণ-হৃদয় লোকের প্রাণ শতধায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঐ বুড়ীর একটী সন্তান ছিল, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ নদীব পারে হয়। তাহাতে বুড়ী দু পয়সা ব্যয় করিয়া ছেলের বিবাহ দিতে বরযাত্রিসহ পারে পাঠাইয়া দেন। বর যাত্রিরা বরের বিবাহ দিয়া কন্যাসহ সমস্ত বরযাত্রি নৌকায় উঠিয়া হাসিতে খেলিতে মহা আনন্দে নদীতে আসিতেছিল। নাবিকগণ তাহারাও উল্লাসিত হইয়া তরি বাহিয়া আসিতে আসিতে যখন ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সকলের মনই উল্লাসিত। তখন বৃদ্ধাও তীরে আসিয়া বেটা বৌকে দেখিবার জন্য আনন্দে অধীরা হইল। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা কি কঠিন! হায়! সে কথা বলিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়, অকস্মাৎ আকাশে একটী কাল মেঘ বসাইয়া প্রবল ঝটীকা বাহির করিল। হায়, সেই কাল ঝটিকা আসিয়া, ক্ষণে বরযাত্রি সহ তরণী ডুবাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলক মধ্যেই নদীগর্ভে সকলই লীন হইল, দাঁড়ি মাজি বলিতে একটী প্রাণী ও রক্ষা পাইল না। দিনে দিনে দিন চলিয়া যাইতেছে, আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি ঐ বৃদ্ধা আজ পর্য্যন্ত পুত্র বধূর শোক ভুলিতে পারে নাই, যখনই নদী ঘাটে জলের তরে আসেন তখনই একবার করিয়া কাঁদিতে থাকেন। হুজুর! কথায় বলে—

মায়ের অস্থি যতদিন মাটীতে পোঁতা।
তথাপি বলে মোর বাছা কোথা॥

এই বৃদ্ধার দশাও তাই, এমন কেহই আত্মীয় নাই যে, উহাঁকে সান্তনা করে।

বৃদ্ধার এই দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া, বড়পীর সাহেবের দয়ার-সমুদ্রে উথলিয়া উঠিল, চক্ষে জল পড়িল; বৃদ্ধার ভাগ্যে পীরের কৃপাদৃষ্টি হইল। তখন তিনি একটী লোক পাঠাইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, তুমি ক্ষান্ত হও, আর কোন চিন্তা করিও না, এখনই তোমার দুঃখের অবসান হইবে, কোলের ছেলে কোলে পাইবে; পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবে। এই কথায় বৃদ্ধার মনে একটুও প্রত্যয় হইল না, সুতরাং সেই ভাবেই মনের দুঃখে কাঁদিতে রহিলেন। হজরত পীর দস্তগীর পুনর্ব্বার খেদ্‌মতগারকে পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে বলিলেন। বৃদ্ধা কিছুতেই বোধ মানিছেনা, খেদ্‌মতগার কহিল, আরে বুড়ী মা। তোমার ভাগ্য ভাল যে, বড়পীর সাহেব তোমার প্রতি মুখতুলে চাহিয়াছেন। এখনি তাঁহার দোয়ার বরকতে তোমার পুত্র বধূ সকলই বাঁচিয়া যাইবে। ইহাতে বৃদ্ধা একটু সুস্থির হইলেন। ওদিকে হজরত বড়পীর সাহেব, সেই সর্ব্ব শক্তিমান দাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নিকটে হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন, হে অন্তর্য্যামী সর্ব্বময়ের কর্ত্তা, সৃষ্টিস্থিতি লয়-প্রলয়-কারী বিশ্ব প্রালক। তুমি সকল ভাবই জ্ঞাত আছ। কৃপা করিয়া এ দীন হীনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিউন। অনাথা বৃদ্ধার পুত্র, বধূ, বরযাত্রি, তরণী, সমুদ্র হইতে স্বজীব উঠাইয়া তাহার মন আশা পূর্ণ করুন। হজরত বড়পীর সাহেব এইরূপ প্রকারে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন ভাব বুঝিতে না পারিয়া, অনেক বিলম্ব দেখিয়া মস্তকের উষ্ণিষ খুলিয়া আবার হস্ত উঠাইয়া বলিলেন, হে জগত পতি! দাতা দয়াময় নাম ধরিয়া, অনাথার প্রতি দয়া করিতে এত বিলম্ব কেন? অমনি দৈববাণী হইল, হে বন্ধুবর! একি মুখের কথা যে বলা মাত্রই অঘটন ঘটন সম্পূর্ণ হইবে? আজ বার বৎসর অতীত হইয়া গেল, বর যাত্রি তরি সহ সমুদ্র গর্ভে কোথায় লীন হইয়া গিয়েছে, তবে তাহা কেমন করিয়া স্বজীব হইবে। আবার তিনি বলিলেন, হে জগত পতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা! বন্ধুর কাছে এত চাতুরি কেন? যিনি "কুন" শব্দে সমুদয় জগত সৃষ্টি করেন, তাঁহার আবার অসাধ্য কি? যিনি পলকে প্রলয় করেন, সমুদ্রকে পর্ব্বতে পরিণত করেন; মরুভূমিকে উর্ব্বরা করেন জনশূন্য নিবীড় অরণ্যকে নগর করিয়া লোকালয়ে পূর্ণ করেন, তাঁহার আবার মৃতকে জীবিত করিতে কতক্ষণ

সময় যায়। পুনরায় দৈববাণী হইল, হে বন্ধুবর! ভাবিয়া দেখুন, যাহাদের অস্থি, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি সমুদ্রের হাঙ্গর, কুম্ভীর উদরস্থ করিয়াছে, একটু চিহ্নও পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেমন করিয়া জীবিত করিয়া দিতে বলেন, ভাবিয়া দেখুন! এমন অসম্ভব কথা বলিয়া বন্ধুকে লজ্জিত করা একি বন্ধুর কার্য্য। হে দয়াময় বিশ্ব জগতের অধীশ্বর! এ আবার কেমন কথা? যে সময় প্রলয় কাল হইয়া আকাশ, পাতাল, সাগর, পর্ব্বত, দেব, দৈত্য, মানব, দানব, পশু, পক্ষী কোন প্রাণী মাত্রেই থাকিবে না; সকলি নীরব নিস্তব্ধ হইবে, কেবল মাত্র আপনি বর্ত্তমান থাকিয়া পুনর্ব্বার সকল প্রাণীর প্রাণদান করিবেন, সেইদিন তবে কেমন করিয়া সকল জীবের পুনঃ উদ্ধার হইবে। পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল, বন্ধু ধ্যান ভঙ্গ কর, চাহিয়া দেখ এবং জগতকে দেখাও, বন্ধু বন্ধুর জন্য কি কার্য্য না করিতে পারে। হজরত পীরদস্তগীর, নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, নদীর ঘাটে সুসজ্জিত বর কনে, বরযাত্রিতে তরণী পরিপূর্ণ। কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, দাঁড়ি মাঝিগণও দাঁড় বাহিতেছে, সেই মহান দৃশ্য দর্শন করিলে পথের পথিক্ যাহারা, তাহারাও একবার চাহিয়া বর-কনের যুগল মিলন, যুগল ভাব দর্শন করিয়া সুখী হয়।

যে যেমন পরিচ্ছদ পরিয়া ডুবিয়াছিল, তাহার তেমনই পরিচ্ছদ পরিধান করা আছে। কাহার জামা ধপধপে বাসীকরা, কাহার জামায় বিবাহ-বাটীর চিহ্নিত রঙ্গের ছিটা, কাহার ময়লা কাপড় পরা, কেবল বর-কনে নবসাজে নবভাবে পাল্কীর ভিতর বসিয়া আছে। পাঠক! সেভাব দর্শন করিলে, মনে করিবেন আজি যেন বর বিবাহ করিয়া কনে লইয়া ফিরিয়া আসিল। হে দাতা দয়ালু দয়াময়। ধন্য তোমার কারিগুরি, ধন্য তোমার দয়াময় নাম। দেখুক, জগত দেখুক। কীর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা শত শত ধন্যবাদ করুক্। তরণী যখন ঘাটে বাঁধিল বরযাত্রি ও বরকনে তীরে নাবিল, নগরবাসীগণ সংবাদ পাইয়া ছুটে আসিল, যে যাহার ভাই বন্ধুকে দেখিয়া উল্লাসিত হইয়া ঘরে চলিল। বৃদ্ধা, পুত্র ও বধূ লইয়া বহুদিবসের শোকতাপ শান্ত করিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া, বড়পীরের চরণে পড়িয়া অনেকটা কাঁদা কাটা করিয়া বলিল, হুজুর! আপনার কৃপায় মৃত পুত্র ও বধূর মুখ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিলাম, পীর সাহেবও তাহাকে দোওয়া করিয়া সেখান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

হজরত বড়পীর সাহেব, মৃত্যুপতি যমের নিকট হইতে মৃত প্রাণীর পরমাত্মা কাড়িয়া লইয়া, অনেকগুলি প্রাণীর জীবন দান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ।

তহফাতল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল হোসেন রফাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন একটী বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, হজরত বড়পীরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার করুণ রোদনে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তাঁহার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, আহা! তাঁহাব সে অবস্থা দর্শন করিলে কঠিন হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি হজরত বড়পীরের চরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হুজুর! আজ আমার একটী স্নেহের পুত্র, হৃদয়ের মাণিক্, অন্ধের যষ্টি, সুখের নিধি, আমাকে জন্মের মত শোক-সাগরে ভাসাইয়া, একাকী রাখিয়া ইহ জগত হইতে চলিয়া গিয়াছে। আর বাছার আমার চাঁদ মুখ দেখিতে পাইব না, আর তার সেই চাঁদ মুখেব সুধামাখা কথা শুনিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পাইব না।

বাছাত আমার চলিযা গিয়াছে, তবে আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার মৃত পুত্রের মঙ্গলের জন্য খোদাতায়ালার নিকটে কিঞ্চিৎ দোওয়া করেন এবং একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাটীতে আসিয়া মৃত পুত্রের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যান, তাহা হইলে এ সময়ে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই। আহা! দযার-সাগব, গুণের আধার বড়পীব সাহেব, বৃদ্ধের এরূপ কাতর বচনে বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধেব দুর্দ্দশা দেখিয়া আর নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলেন না; তখনই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। হজবত বড়পীর সাহেব, বৃদ্ধের বাটী গিয়া, তাহার মৃত পুত্রের রূপলাবণ্য দেখিয়া হজরতের দয়াবাবি উথলিয়া উঠিল, আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখনই ধ্যানে (মোরাকেবায়) বসিলেন, হজরত মোরা-কেবায় বসিয়া ধ্যানযোগে মালেকোল মওত সমনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, হে মৃত্যুপতি কৃতান্ত! শীঘ্র এই বৃদ্ধের পুত্রের মহাপ্রাণি-পরমাত্মা আমাকে ফিরাইয়া দিন আমি এ পুরবাসীদেব আর ক্রন্দনধ্বনি সহ্য করিতে পারিতেছি না এখনই বাল-কের প্রাণদান করিয়া উহার মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করিয় লইব। মৃত্যুপতি যম কহিলেন, কি আশ্চর্য্য কথা! যাহা কখন শুনি নাই

এবং কেহই বলিতে সাহস পায় নাই, আপনি আমাকে তাহাই বলিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনার মত মহৎ ব্যক্তির মুখে একথা আনা কি সম্ভব? লোকের প্রাণ বাহির হইলে কি সে প্রাণ আবার ফেরৎ পাইয়া থাকে? যাহা বলিবার কথা নয়, আপনি আমাকে তাহাই বলিতেছেন। আমি বৃদ্ধের পুত্রের প্রাণ হরণ করিয়াছি, তাহা আপনার কি? আমার কার্য্য আমি করিতেছি, আপনার যে কার্য্য, তাহা আপনি সমাধা করুন; আমার কার্য্যের সঙ্গে আপনার কোনও সংশ্রব নাই। কালের কুটিল বাক্যে, বড়পীর সাহেব রুষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নিষ্ঠুর যম! তোমার হৃদয় নির্ম্মম, নির্দ্দয়, কঠিন, পাষাণ নির্ম্মিত। তাই তুমি কঠিন হৃদয়ে কাহাকেও বন্ধু হারা, কাহাকেও জ্ঞাতি হারা করাইয়া, কোন স্ত্রীর পতি হারা করাইয়া, কোন পিতার পুত্র হারা করাইয়া, হা পুত্র, হা পুত্র রবে কাঁদাইতে কাঁদাইতে তাঁহাকে গভীর শোক-সাগরে ডুবাইতেছ। কাহাকেও অবিরত অশ্রুজলে ভাসাই-তেছ, আবার কাহার হৃদয়ে জ্বলন্ত হুতাশন জ্বালাইতেছ। কাহারও পূর্ণ সংসার হাত বাড়াইয়া স্বমূলে নির্ম্মূল করিতেছ যে তরুবরের আশ্রয় লইয়া শত শত পক্ষী সুখে বিরাজ করিতেছে, তাহাকেও সমূলে উৎপাটন করিয়া, পক্ষীর শাবক, ডিম পর্য্যন্ত অকালে নষ্ট করিয়া

দিতেছ। যে সুন্দর লোকরঞ্জন কুসুম সুবাসে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিত, হে নির্দ্দয় কাল! তাহাকেও তুমি নষ্ট করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাক। বুঝিলাম তুমি জগতের সুখ দেখিয়া অত্যন্ত যাতনা ভোগ কর। তাই তুমি এরূপ কঠিন কার্য্য করিতেই ভালবাস। রে নির্দ্দয় কাল। কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ বলিয়া কি তোমার হৃদয় এত কঠিন? তখন কৃতান্ত কহিলেন, হে তাপস প্রবর! আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, ইহা নিজের ইচ্ছায় নয়। ইহাও সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রলয়কারী কর্ত্তার আদেশে। আমি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কখন কাহার মহাপ্রাণী হরণ করি নাই এবং তাঁহার আদেশ ব্যতীত পরমাত্মা কাহাকেও দিতে পারি না। দয়াময় বিশ্ব পালকের অনিচ্ছায় আমার যদি জীবের জীবন সংহার করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ আপনিও আমার করে প্রাণ হারাইয়া বসিতেন। এতগুলি কথা কহিবার আর অবকাশ পাইতেন না। হজরত মৃত্যুপতি যমের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন, এবং এক লম্ফেই তাঁহার হস্তস্থিত জাঁম্বিল কাড়িয়া লইলেন (১)। যমরাজ (মালে-

(১) জাঁম্বিল একপ্রকার থলি। জীবন প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্বের লিখন।

কল্ মওত) সেইদিন তিনি যত জীবের প্রাণহরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ঐ জাঁম্বিল মধ্যে রাখিয়াছিলেন হজরত বড়পীর সাহেব তখনই জাঁম্বিল (থলেব) মুখ খুলিয়া ঝাড়া মারিয়া বলিলেন, হে আত্মা সকল! তোমাদের সৃজন কর্ত্তা প্রতিপালকের শপথ এখন তোমরা স্ব স্ব দেহে প্রবেশ করিয়া পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হও। আহা, দয়াময়ের কি আশ্চর্য্য লীলা, বড়পীরের কি বাক্যের সত্যতা, সকল আত্মা গুলিই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিয়া জীবন লাভ করিল। তন্মধ্যে কত শত পশু পক্ষীরও প্রাণ ছিল। সে সকল পশু পক্ষীরাও জীবন দান পাইয়া যে যার স্থানে বাসা লইল। মনুষ্যগণও জীবন প্রাপ্ত হইয়া, যে যাহার সমাধি স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বৃদ্ধের পুত্রে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলে, তাহার মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনবর্গ সকলেই আনন্দে অধীর হইল, কান্না মুখে হাসি আসিল, সকলেই পীর সাহেবকে লক্ষ লক্ষ সালাম জানাইল। এ দিকে মৃত্যুপতি যম, মৃতজীবের আত্মা হারাইয়া মহা ভাবনায় পতিত হইলেন, খোদাতায়ালা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিয়া যে উত্তর করিবে তাহার উপায় না পাইয়া নিরুপায় অন্তরে হেট মুণ্ডে কতই কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল, হে মালেকল মওত! আমার বন্ধুর সম্মান রাখিয়া,

কেবল যদি বৃদ্ধের পুত্রের একটী প্রাণ ছাড়িয়া দিতে, তাহা হইলে আজ তোমার হরণ কবা এতগুলি প্রাণ হাত ছাড়া হইত না এবং অদ্যকার জীব জন্তু সকলই পুনর্জ্জীবন লাভ করিত না আজ তুমি আমার বন্ধুর সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু তজ্জন্য তুমি আমার নিকট সম্পূর্ণ দায়ী। মৃত্যুপতি বিশ্বপালক খোদতায়ালার নিকট হইতে এরূপ দৈববাণী শ্রবণ কবিয়া, ভয় বিহ্বল চিত্তে প্রার্থনা করিলেন, হে করুণাময় জগতপালক অনাদি অনন্তময়! তোমার মহিমা বুঝা ভার, কাহাকে কেমন ভাবে চালনা কব, তাহা কাব সাধ্য যে হৃদয়ঙ্গম করে আমি একজন ক্ষুদ্র দূত মাত্র, সাধ্য কি যে তোমার লীলা খেলা বুঝিতে পারি, তবে যাহা দোষ করিয়াছি, তাহা কৃপা করিয়া আপনার বন্ধুবর আব্দোল কাদের জিলানীর মহৎ গুণের দ্বারায় আমাকে ক্ষমা করুন। পুনবায় আদেশ হইল, হে মৃত্যুপতি! আমি তোমাকে কখনই ক্ষমা করিতাম না, কেবল আমার মহবুবের সাহায্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলে বলিয়া তোমাকে ক্ষমা ক বিয়া দিলাম।

হজরত বড়পীর সাহেবের নামের গুণে পঞ্চদশ বর্ষিয় রোগী রোগমুক্ত হয় তাহার বিবরণ।

আনসেল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল হোসেন হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আবুল আহাম্মদের পুত্র জাফর আহাম্মদ একদিন হজরত বড়পীর সাহেবের নিকটে আসিয়া করুণস্বরে বলিলেন, হুজুর! আমার একটী পুত্র সন্তান পঞ্চদশ বৎসর প্রায় অতীত হইয়া-গেল কঠিন রোগে শর্য্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে, দিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়াতে মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সম্ভব। কেননা ক্রমেই হাড় মাস অস্থি পাঞ্জর একসঙ্গে জড়িভুত হইয়া আসিতেছে। আর তাহার হাঁটু দুইটী শুষ্ক হইয়া কেবল অস্থিসার হইয়াছে। আপনি ইহার একটু তদ্‌বির করিয়া দিন, যাহাতে বালকটী আরোগ্যলাভ করে। হজরত কহিলেন, যাও, তাহার কর্ণে মুখ দিয়া "উম মলোদম শেখ আব্‌দোল কাদেরকা হুকুম হেয়" এই মন্ত্রটী বলিয়া ফুক দিয়া, পুনরায় বলিবে, এই বালকটীকে ত্যাগ করিয়া হোল্লাহার (*) দিকে শীঘ্র শীঘ্র

(*) হোল্লাহা একটী দূরবর্ত্তী গ্রামের নাম।

চলিয়া যা ; এইরূপ বলামাত্রেই তোমার সন্তান কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বড়পীরের বচনটী শিক্ষা করিয়া জাফর আহাম্মদ সেইরূপ প্রকারে কর্ণে মন্ত্রপুত করিয়া ফুক দিতেই বালকটী আরোগ্যলাভ করিল। আর কখনই তাহাকে জ্বর জ্বালা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বড়পীরের নামের গুণে সকল বিপদই বিনাশ হয়।

বড়পীর সাহেবের দোয়ায় বোগদাদ সহরের ওবা (কলেরা) বিনাশ পায় তাহার বিবরণ।

গোলজার মানি নামক গ্রন্থে শেখ আলি বোগদাদি হইতে বর্ণিত আছে যে এক বৎসর বোগদাদ সহর মধ্যে এমন কলেরা রোগের আবির্ভাব হয়, তাহাতে সহরের প্রত্যহ শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে কলেরার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। প্রত্যহ সমাধিস্থান কবরে পূর্ণ হইতে লাগিল অবশেষে নগরবাসীগণ নিরুপায় হইয়া বড়পীরের পায়ে প'ড়ে নিবেদন করিল, হুজুর। আর ত তিষ্টিতে পারিনা ; প্রত্যহ সহরের

মধ্যে শত সহস্র লোক কলেরার করালগ্রাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পরলোকে গমন করিতেছে। তখন তিনি তাহাদের সেই কাতর বচনে সদয় হইয়া বলিলেন, আমার মাদ্রাসার সম্মুখ হইতে তৃণগুলি লইয়া জলের সহিত পিসিয়া পান করিলেই করাল বদন কলেরা রোগের হস্তে রক্ষা পাইবে, আর একটী প্রাণি মাত্রও মরিবে না। হজরত মহবুবে সোবহানি (রঃ) মুখে শ্রবণ করিয়া মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তি স্থান হইতে দুর্ব্বাঘাস লইয়া সকল লোকই রোগীদিগকে সেবন করাইয়া দুরন্ত কলেরার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল, এমন কি সেখানকার ঘাস ফুরাইয়া গেলে তৃণ মূল পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া গেল। সেই সহরের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক অকালে কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও বড়পীরের প্রশংসা করিতে লাগিল। হজরত বড়পীর সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বোগদাদ নগরে দুরন্ত কলেরা প্রবেশ করিতে পারে নাই। বড়পীরের নামের গুণে শমন পর্য্যন্ত পলাইতে পথ পায় না।

একটী স্ত্রীলোকের বড়পীরের আশীর্ব্বাদে সাতটী সন্তান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয় তাহার বিবরণ।

মেরাতল জামির নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আব্‌দোল্লা মহাম্মদ বেন কায়েদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হজরত বড়পীর সাহেব, সাধারণজনকে ওয়াজ বা উপদেশ দান করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে নিজের কক্ষমধ্যে পরম পিতা জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করিতে ছিলেন। পরে তিনি অর্চ্চনা উপাসনা সমাপ্ত করিয়া দেখিলেন যে, দ্বারদেশে একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হজরত বড়পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা বাছা! তুমি কি মনে করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছ? রমণীটী অমনি সালাম করিয়া বলিল, হুজুর! জোনাব পীর দস্তগীর! এ অধম অনাথিনীর একটী প্রার্থনা আছে, আমি ঈশ্বর কৃপায়, আপনার দোওয়ায় কোন বিষয়েই চিন্তা করি নাই, কেবল পুত্র ধনবিনে মনকষ্টে রাত্রদিন যাপন করিতেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অধম বাঁদীর জন্য খোদাতাযালার নিকটে প্রার্থনা করিয়া, একটী

সন্তান খাঁচাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি পুত্র মুখ দেখিয়া বড়ই সুখি হই। তখন তিনি বলিলেন, হে মন্দ ভাগ্য-বতী! আমি তোমার লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার অদৃষ্টে পুত্র নাই, তবে, মিছে কেন পুত্রের আশা করিতেছ। যাও, তোমার মনস্কামনা কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে কহিল, হুজুর! সত্য, আমি মন্দ ভাগ্যবতী নারী, তবে এখন আমি ভাগ্যবান মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসিয়া স্থান লইয়াছি। পথিক পথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেই সুস্থ হইবার জন্য বটবৃক্ষের আশ্রয় লইয়া থাকে, বটবৃক্ষও পথিককে ছায়া দিয়া ও নিজের পল্লব হিল্লোলে বায়ুদান করিয়া, আশ্রিত পথিককে সুস্থ বা সুখি করিয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া, জল জল করিয়া সরোবরে উপস্থিত হয়, সেই সরোবর তাহাকে সুশীতল বারি দান করিয়া তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করে। অনাহারী ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র ব্যক্তি যখন অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়, তখন গৃহকর্ত্তা তাহাকে কিঞ্চিৎ দান না করিয়া বিদায় করে না। তবে আমি অনাথিনী ভিখারিণী পুত্রধন-কাঙ্গালিনী যে আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহা আপনি দাতা

হইয়া, দান না করিয়া, কিরূপ প্রকারে ভিখারিণীকে ভিক্ষা না দিয়া বৈমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন। শুনিয়াছি, আপনি দাতার শ্রেষ্ঠ, দাতব্যের অগ্রদানি; আপনার কাছে কেহ কখন কোন বিষয়ে নিরাশা হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। যে যাহা জাচিঞা করে আপনি তখনই তাহাকে তাহা দান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এমন কি চোর পর্য্যন্ত আপনার গৃহে চুরি করিতে আসিয়া নিরাশা বা হতাশ অন্তরে ফিরিয়া যায় না। তবে আমি কেন নিরাশা হইয়া ফিরিয়া যাইব। রমণীর বিনয় বচনে, হজরত পীর দস্তগীর আর থাকিতে পারিলেন না; সেই স্ত্রীলোকটীর জন্য হস্ত উঠাইয়া খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে দাতা দয়ালু দয়াময় বিশ্ব পালক সৃষ্টিকর্ত্তা! এই অনাথিনী পুত্র-কাঙ্গালিনীকে দয়া করিয়া পুত্ররত্ন দান করিয়া সুখি করুন। তখনি আরশ-বাড়ি হইতে দৈববাণী হইল যে,

কাদ জাফ্‌ফাল্ কালাম বেমা হুয়া ফি এলমেল্লাহে।

অর্থাৎ এ স্ত্রীলোকটীর অদৃষ্টে এরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ভাগ্যদোষে নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে। পুনরায় তিনি প্রার্থনা করিলেন, হে কৃপাময় কৃপা করিয়া নিঃসন্তানকে সন্তান দান করুন। তখনও ঐরূপ আদেশ হইল। ষষ্ঠ বারের পরে হজরত পির দস্তগীর উত্তর

করিলেন, হে দয়াময়। যাঁহার লিপি তিনি কি খণ্ডন করিতে পারেন না, অবশ্যই পারেন; আপনি আমার বিনিময়ে ঐ স্ত্রীলোকটীকে পুত্রদান করিয়া সুখি করেন। এবার দয়াময়ের নিকট হইতে দৈববাণী হইল যে হে বন্ধুবর। তোমার সম্মান রক্ষার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটীকে সাতটী পুত্র দান করিয়া সুখি করিলাম। আর প্রার্থনা করিবেন না সপ্তমবার প্রার্থনা করিয়া ছিলেন বলিয়া, তজ্জন্য সাতটী পুত্র দান করিলাম; নতুবা উহাকে নিঃসন্তান হইয়া থাকিতে হইত। হজরত বড়পীর সাহেব শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, আপনার চরণতলের কিঞ্চিৎ ধূলা লইয়া, মনে মনে একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই ধূলাগুলি স্ত্রীলোকটীর হস্তে দিয়া বলিলেন, যাও। তুমি সাতটী পুত্র সন্তান প্রসব করিবে। কিন্তু সাবধান। ধূলাগুলি অতি যত্নের সহিত রৌপ্য নির্ম্মিত কবচ করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাখিবে। হজরতের চরণধূলা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া স্ত্রীলোকটী গৃহে ফিরিল, কিছু দিন পরে ঈশ্বর কৃপায় একে একে সাতটী পুত্র প্রসব করিয়া ছেলের মা হইল। তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। একদিন মন্দভাগিনী স্ত্রীলোকটী কুপ্রবৃর্ত্তির বশীভূত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বড় পীরের পায়ের ধূলার

গুণেই কি আমার সাতটী পুত্র হইল, না, না, তাঁহার পায়ের ধূলার এমন কি গুণ আছে যে, উহার দ্বারায় আমি সাতটী সন্তান প্রসব করিলাম। যাই হোক আর কেন পায়ের ধূলা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিব। এই বলিয়া অবিশ্বাসী কু-লক্ষণা নারী কবচ হইতে ধূলাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

হায়, অবিশ্বাসী রমণীর আবার বিশ্বাস কি। মন্দ-ভাগিনীর সৌভাগ্য কত দিনের জন্য, দুশ্চিন্তাই সকল অনর্থের মূল। কুভদ্রা রমণী যেমনি কবচ হইতে ধূলা-গুলি নিক্ষেপ করিল, অমনি সাতটী ছেলে দেখিতে দেখিতে দম্‌ছুটে মরিয়া গেল। হতভাগিনী মাতা অকস্মাৎ ধূলার কারণে ছেলের মরণে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। ভাগ্য নিরক্ষিয়া শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হায় কি হইল সাতটী ছেলে কোথায় গেল বলিয়া, আছাড় কাছাড় খাইয়া অবশেষে বড় পীরের চরণ তলে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, হজরত তাহাকে বলিলেন, রে অবি-শ্বাসী কুলক্ষণা রমণী। তোমার নিজের দোষেই তোমার ছেলেগুলির মৃত্যু সঙ্ঘটন হইয়াছে; এখন আর পায়ে পড়িলে কি হইবে। যখন আমি তোমাকে চরণ ধূলি দিয়াছিলাম। তখন আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম যে,

আমার চরণ ধূলা ত্যাগ করিলে হে মহাপ্রাণী সাতটী তোমরাও স্ব স্ব দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া যাইবে। কেননা ঐ ধূলার সঙ্গে তোমার ছেলেদের দেহ সংলগ্ন ছিল, তজ্জন্যই তোমার ধূলা ত্যাগ করাতে, ছেলে কয়টী জীবন ত্যাগ করিয়াছে। যাক, আর কেঁদনা, যা হইবার তাহা হইয়াছে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। পুনরায় তুমি আমার পদধূলি লইয়া যাও, এখনই সাতটী ছেলে পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। স্ত্রীলোকটী গৃহে আসিয়া দেখিল যে, সাতটী ছেলেই জীবন লাভ করিয়া খেলা করিতেছে। সেই দিন হইতে সেই রমণী বড়পীরের কেরামতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিল।

এস পীর দস্তগীর কৃপা কর মোরে।
দাও তব পদধূলি রাখি লয়ে শিরে॥

হজরত বড়পীর সাহেব একটী মোরগ খাইয়া জীবিত করেন তাহার বিবরণ।

মেরাতল ফায়েজান নামক গ্রন্থে এমাম আফি মহমাতুল্যা আলায়হে বড় পীরের আহার ব্যবহারের সমন্ধে

নানা বিষয় লিখিয়াছেন যে, একটী বৃদ্ধা সদা সর্ব্বদা পীরের কাছে আসা যাওয়া করিত এবং পীরের নিকটে আপনার একটী ছেলেকে রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিল। একদিন ছেলেটীকে সঙ্গে লইয়া বড় পীরের দরবারে উপস্থিত হইল। তৎপরে বৃদ্ধা কহিল, হুজুর। আমার এই পুত্রটীকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম; আপনি তাহাকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিদ্যায় বিদ্বান করিয়া দিবেন। যাহাতে সে করুণাময় খোদাতায়ালাকে চিনিয়া, ইহকাল ও পরকালের উন্নতি লাভ করিতে পারে। যেন আপনার চরণ সেবা করিয়া সাধুত্ব লাভ করিয়া সকলের নিকট পূজনীয় হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা বড় পীরের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। পীর সাহেবও বৃদ্ধার কথামত তাঁহার পুত্রকে গুপ্ততত্ত্ব বা যোগ সাধনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রথম ইন্দ্রিয় দমন, ধৈর্য্য, সহ্যগুণ, রাত্রি জাগরণ, উপাসনায় মন নিবেসন, ক্ষুধায় ধৈর্য্যধারণ করিতে২, কঠিন আহার করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ষড়রিপুকে বশ করিবার জন্য তাহাকে শুষ্ক রুটী খণ্ড, বা কখন কখন চানা খাইতে দিতেন। একদিন বৃদ্ধা ছেলেকে দেখিবার জন্য পীর দরবারে আসিয়া প্রথম দেখিল যে, ছেলেটী জীর্ণশীর্ণ হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, একটী কক্ষ মধ্যে বসিয়া চানা চিবাইতেছে।

বৃদ্ধা ছেলের এরূপ কঠিন অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িল। আহা, মায়ের প্রাণ; ছেলের খাওয়া পড়ার কষ্ট দেখিলে কি সহ্য করিতে পারে। সহজেই হৃদয় ব্যথিত হইয়া, আকুল হইয়া পড়ে। বৃদ্ধা ছেলের অবস্থার কথা মনে করিয়া, বড় পীরের কক্ষে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন যে, তিনি মোরোগের মাংস দিয়া আহার করিতেছেন। তাহা দেখিয়া বুড়ির প্রাণে সহ্য হইল না, তখনই অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া ফেলিল, হুজুর! আপনি মোরগের মাংস দিয়া আহার করিতেছেন, আর আমার ছেলে শুষ্ক চানা চিবাইতেছে? আহা, বাছার আমার না খাওয়ায় অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে পীর সাহেব বৃদ্ধার কথা শুনিয়া, একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধা! ছেলের অবস্থা দেখিয়া মনে কষ্ট করিতেছ? যদি সুখ-ভোগ করিয়া তোমার ছেলে কু-প্রবৃর্ত্তির বশীভুত হইয়া পড়ে, তবে কেমন করিয়া গুপ্তপথ প্রাপ্ত হইবে। সাধু হওয়া বড়ই কঠিন। ও পথ বড়ই ভয়ঙ্কর! কষ্ট না করিলে কেহ কখন সাধু হইতে পারে না। দুগ্ধফেন সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কেহ যদি সাধু হইতে পারিত তাহা হইলে, প্রভু হজরত মহাম্মদ (সঃ) সাম বা সুরিয়ার ও আরবের রাজাধিরাজ হইয়া, সুকোমল শয্যায় শয়ন না করিয়া, খর্জ্জুর পাতার শয্যায় শয়ন করিতেন,

অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধার লাঘবের জন্য উদরে খণ্ড প্রস্তর বান্ধিয়া রাখিতেন, তালি দেওয়া ছেঁড়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন। তাঁহারই জামতা বা সহচর আমার পিতৃপুরুষ দাদা সাহেব সাধু শ্রেষ্ঠ গুপ্ত-তত্ত্বের প্রধান গুরু আলি করমুল্যা অজহু, কুফার রাজসিংহাসনে বসিয়া পাঁচ দেরহেমের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন, বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেন, নিজের হস্তে উষ্ট্র বান্ধিতেন, সময়ে সময়ে ঘরে খাবার আহার না থাকিলে সন্ধ্যা ও ভোরে জলপান করিয়া খোদাতায়ালার নামে রোজা বা উপবাস থাকিতেন।

বৃদ্ধা মহাপুরুষদের জীবনি শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, হজরত পীর সাহেব! আমি মেয়ে মানুষ, অত বুঝি কি? না অত জানি। হজরত বলিলেন, বৃদ্ধা মা! সাধু হওয়া মুখের কথা নয়, সাধনা করাও সামান্যে হয় না, শুনিয়া থাকিবে; ঐ পদপ্রাপ্ত হইবার জন্য বলখের অধিপতি সম্রাট এব্রাহিম আদহাম রাজ-সিংহাসন—রাজ্যত্যাগ করিয়া অনাহারে কত কঠিন ব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, এমনকি প্রাণের পুত্র ক্রোড়ে থাকিয়া জীবন ত্যাগ করিল, তথাপি তাহার দিকে ফিরেও তাকাইলেন না, তখনই মৃত শব দূরে রাখিয়া খোদাপ্রেমে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখুন তাঁহাদের সহ্য সহিষ্ণু-গুণ। হাঁ, তবে বলিতে পার আপনি যে মোরগ মাংস.

দিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিলেন। ইহাও বুঝিয়া বা দেখিয়া নাও। এই বলিয়া গুণময় পীর সাহেব সমুদয় মোরোগের হাড় একত্র করিয়া তাহাতে পবিত্র হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "কোমী বেজ্‌নেল্লাহে ল্লাজি" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার কৃপায় জীবিত হও। আহা তাঁহার বাক্যের মহিমা-শক্তিগুণে তখনই মোরগটী জীবিত হইয়া গেল। তখন বড়পীর সাহেব বুড়িকে বলিলেন, হে বৃদ্ধা তোমার ছেলেটীও যখন এইরূপ সাধুত্ব লাভ করিয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইবে, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে। বৃদ্ধা বড় পীরের কেরামত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল।

শেখ আলি নামক একজন আরবী বড়পীরের পৃষ্ঠে পিঠ ঘর্ষণ করিয়া একটী পুত্র লাভ করে তাহার বিবরণ।

আখবারল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আলী বেন মহাম্মদ আরবী নামক একজন সম্পত্তি-শালী ধনবান লোক ছিলেন, তাঁহার অর্থে অনেক দিন দুঃখী প্রতিপালন হইত। তিনি দরিদ্র দিগকে দান না

করিয়া কখন কোন দ্রব্য খাইতেন না। তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরও অভাব ছিল না, তিনি সেই দেশের মধ্যে ধনে, মানে, রূপে, গুণে, বীরত্বেও অশেষ ক্ষমতা শালী বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়েরই অভাব ছিল না, কিন্তু নিঃসন্তান হইয়া, পুত্র বিহনে মনকষ্টে দিনযাপন করিতেন। তিনি এতদূর পুত্রের জন্য লালায়িত ছিলেন যে, যদি কাহার মুখে কোন সাধু বা তপস্বীর কথা শুনিতেন, তখনই তাঁহার চরণ সেবা করিয়া পুত্রের কামনা করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে পুত্রলাভ করিবে বলিয়া এই শুভ সংবাদ দানে সুখি করিতে পারেন নাই। একদিন শুনিলেন যে, দেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন মহা তপস্বী সাধু পুরুষ আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া শেখ আলী আর কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সাধু পুরুষের চরণ দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া, অতি বিনয় বচনে কহিলেন, হুজুর! আমি নিঃসন্তান, যাহাতে আমি সন্তান লাভ করিয়া পুত্রের মুখ দেখিতে পাই; আপনি তজ্জন্য খোদাতায়ালার কাছে আমার জন্য একটু দোয়া করিবেন। সেই মহান হৃদয় সাধু পুরুষ শেখ আলির দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে ভক্ত! আমি তোমার সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে বা জানিতে পারিয়াছি। তোমার অদৃষ্টে পুত্র কি কন্যা কিছুই নাই

তজ্জন্য কোন সাধু পুরুষের দোয়াও তোমার কোন ফলদায় হয় না, আর হইবেও না তবে বৃথা কেন খোদাতায়ালার নিকটে তোমার জন্য প্রার্থনা করিব। তখন তিনি নিরাশা হইয়া হতাশ মনে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেইদিন হইতে আর কোথাও গমনাগমন না করিয়া, কেবল মাত্র খোদাতায়ালার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। গৃহে যতই ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য থাকুক না কেন, সে সকল বিষয় পুত্রধন বিনে বিষধর ভুজঙ্গের দংশন বলিয়া বোধ হইতে থাকে। রত্ন খচিত হীরা মানিকের উজ্জ্বল আভা, এক পুত্রের জ্যোতিঃ অভাবে সকল রত্নের উজ্জ্বলতাই নষ্ট করে। শেখ আলী পুত্রের জ্যোতিঃ হীন ঘরে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্র বোগদাদ সহরে আসিয়া, বড় পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিল। পীর সাহেবও তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়া আপন দরবার মধ্যে রাখিয়া দিলেন। শেখ আলি পীরসাহেবের যত্ন, স্নেহ ও আদর পাইয়া কিছুদিন রহিয়া গেল একদিন নির্জ্জনে বসিয়া দুইজনে কথোপকথন হইতেছে এমন সময়, শেখ আলি পীরের সরল মন দেখিয়া সাধুদিগের কথিত আপনার অদৃষ্টের ফলাফল বর্ণনা করিয়া, পুত্র কামনা নিষ্ফল ভাবিয়া পীরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হজরত পীর দস্তগীর

তাহার ক্রন্দন দেখিয়া, দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন, আলী! তুমি উঠ, আর তোমার ক্রন্দন আমার সহ্য হয় না, তোমাকে আর পুত্রের জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে না, অবশ্যই পুত্র মুখ দেখিয়া সুখি হইবে। তখন শেখ আলী কহিল, হুজুর! আমার নিতান্ত অভাগা কপাল! অদৃষ্টে যখন পুত্র নাই, আর কাহারও দোয়ায় সুফল নাই; তখন কেমন করিয়া পুত্রের মুখ দেখিয়া সুখি হইব। তখন তিনি কহিলেন, আলী! আমি তোমার করুণ ক্রন্দনে অধির হইয়া, পুত্রের বর দিয়াছি; তখন তোমার অদৃষ্টে পুত্র না থাকিলেও দোয়া আমার ফলোদয় না হইলেও আমার নিজের ঔরসজাত একটী ছেলে জন্ম হইতে যে বাকী আছে আমি তাহা তোমাকে দান করিলাম; ঐ ছেলে তোমার ঔরস হইতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে তখন তুমি ঐ বালকটীর আমার নামের সঙ্গে মিলাইয়া উহার নাম শেখ মহিউদ্দিন রাখিবে। আমার আশীর্ব্বাদে এই বালকটী একজন মহা পরাক্রমশালী সাধু পুরুষ হইবে। হজরত বড়পীর এই বলিয়া, শেখ আলীর পৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিয়া দিলেন, দয়াময়ের কৃপায় পীরের আশ্চর্য্য কেরামতে তখনই সে কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল। আলী সন্তোষ হৃদয়ে গৃহে আসিয়া সেই রজনীতে স্ত্রীসহবাস করাতে,

তাহার পত্নী গর্ভবতী হইল, দশমাস পরে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সাত দিবস পরে শেখ আলী আরবী শিশু পুত্রটী কোলে লইয়া হজরত পীরের কাছে আসিয়া ধরিল। তিনি বালককে কোলে লইয়া নানা প্রকারের শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া শেখ আলীকে দিলেন। শেখ মহাম্মদ বোরহান পুরী বলিয়াছেন যে, ঐ বালকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় বিদ্যান হইয়া, মহা সাধু পুরুষ হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম কোতব হজরত বড়পীর দ্বিতীয় কোতব শেখ মহিউদ্দিন আরবী ইনি আরব্য ভাষায় তছয়েফের নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

হজরত সাহাবদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত।

বেদায়াতল আহ্ওাল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এব্নে তিয়াল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন মহাম্মদ আব্দোল্যা সহরদর্দ্দির পত্নী হজরত বড় পীরের নিকটে আসিয়া, বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন। হে পীর দস্তগীর মহবুবে সোবহানি! আপনার আশীর্ব্বাদের গুণে

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে বিষয় সম্পত্তি দিয়া জগত মধ্যে বড়ই সুখের সঙ্গে রাখিয়াছেন। কোন বিষয়েরই চিন্তা করি নাই, কিন্তু পুত্রধন বিহনে সকলই অসার। তবে যদি আপনি দয়া করিয়া এ অভাগিনীর জন্য খোদাতায়ালার কাছে দোয়া করেন, তাহা হইলে পুত্রের মুখ দেখিয়া সুখি হইতে পারি। নতুবা দুঃখ-সাগরে পড়িয়া চির-জীবনের মত কষ্ট পাইতে হয়। এখন আপনার কৃপা ব্যতীত, আমার এ দুর্দ্দশা মোচন হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই, হজরত বড়পীর সাহেব স্ত্রীলোকটীর বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া, দয়াময় বিশ্বপালক ধরণীর অধীশ্বর খোদাতায়ালার নিকট হস্ত তুলিয়া বলিলেন ; হে দাতা দয়ালু দয়াময়। আপনি সকলই অবগত আছেন, ত্রিজগতের মধ্যে আপনার অবিদিত কোন বস্তু নাই এবং আপনার ভাণ্ডার সর্ব্ব বিষয়েই পরিপূর্ণ। আজ একটী অবলা সরলা নারী আপনার দয়ার প্রার্থী, তাঁহাকে দয়া-করিয়া একটী পুত্রদান করিয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিউন। তখনই দৈববাণী হইল, হে প্রিয়বন্ধু আব্‌দোল কাদের! উহার আশাপূর্ণ হওয়া দুস্কর ; যাহার ভাগ্যে সন্তান নাই, সে কেমন করিয়া পুত্র সন্তান লাভ করিবে। হজরত পীরদস্তগীর দর্গাবারী হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় বলিলেন, হে করুণাময় বিশ্বজগতের

অধীশ্বর! দাসীর সঙ্গে প্রতারণা করিতেছেন কেন? আপনার ভাণ্ডারে অভাব কি? এই রমণীকে বৃথা কেন আপনার দয়াবারি হইতে বঞ্চিত করিবেন। এবারেও সেইরূপ আদেশ হইল; ইহা শুনিয়া হজরত বড়পীর সাহেব বিষন্ন বদনে ছিন্ন ভিন্ন বেশে মস্তকের উষ্ণীব খুলিয়া বলিলেন, হে দয়াময়। আজ আপনার দয়াময় নামের পরিচয় ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব, আপনি যদি জীবের প্রতি দয়া না করিবেন, তবে কেন দয়াময় নাম ধারণ করিয়াছেন? দেখি এই ভিখারিণীর প্রতি দয়া করেন কি না করেন? আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতক্ষণ না সুসংবাদ দান করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি জল আহার কিছুই পান করিব না। যথার্থ আমি যদি হজরত মহাম্মদ (সঃ) কে আরশে যাইবার কালে তাঁহার চরণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া থাকি, যথার্থ যদি তোমার প্রেরিত সিংহ হজরত আলি করমুল্যা অজহুর বংশে বা সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি; তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার দয়াবারি নিশ্চয় বর্ষণ করাইয়া লইব। তাঁহার এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আকাশ, ভূমণ্ডল, স্বর্গীয় দূত পর্য্যন্ত থরথর করিতে লাগিলেন। হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) আর থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে বড় পীরের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, হে হৃদয় আরাধ্য

দেবতা! শান্ত হও, শান্ত হও, থাম, থাম, ধ্যান ভঙ্গ কর, মস্তকে উষ্ণিষ ধারণ কর; তোমারি প্রার্থনা পূর্ণ হইল। এই ভাগ্যবতী রমণী গর্ভবতী হইবে, তুমি উহাকে সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়া দাও, এই বলিয়া মহাপুরুষ নুরনবী তখনই অন্তরধ্যান হইলেন। হজরত বড়পীর সাহেব পাগ্‌ড়ী তুলিয়া মস্তকে বান্ধিলেন, পরে সেই রমণীকে শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। রমণী শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই রজনীতেই পতি সম্মিলনে গর্ভ ধারণ করিয়া খোদা-তায়ালাকে (শোকর) শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বিধির কৃপায় কিছুদিন পরে একটী কন্যা প্রসব করিল। রমণী কন্যা প্রসব করিয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু ততধিক সুখি হইল না। আশায় ছিল পুত্র প্রসব করিয়া বেটার মা হইব। তাহাত ঘটিল না কাজেই একটু মনমরা হইয়া থাকিতে হইল। দুই তিন বৎসর অতীত হইবার পরে একদিন কন্যাটীকে সঙ্গে লইয়া পীর দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিল, হুজুর! এ অভাগিনী বড়ই আশা করিয়া-ছিল যে, পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সুখি হইবে। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই মেয়ে ছেলেটী প্রসব করিয়াছি। কি করিব মনের দুঃখ মনেই রহিল; হুজুরের কাছেও আমি পুত্রের কামনা করিয়াছিলাম, তাহাত সফল হইল না,

তজ্জন্য আমি মেয়েছেলেটীকে সঙ্গে লয়ে হুজুরের নিকটে আসিয়াছি। এই মেয়েছেলেটী আমার, হুজুরের সম্মুখে আদবের সহিত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছে। হজরত বড়পীর স্ত্রীলোকের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া মেয়েছেলের পা হইতে নাভী পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার সেই চাহনি গুণেই মেয়েছেলেটীর পা হইতে নাভী পর্য্যন্ত পুরুষ অঙ্গ হইল এবং ছাতি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্ত্রী অঙ্গের আকৃতি রহিয়া গেল। পরে স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, এবার ত তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী কহিল, হাঁ, আপনার চাহনি গুণেই আমার কন্যাটী পুরুষ অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি শত শত ধন্যবাদ করি সেই অনাদি অনন্তময় বিশ্বস্রষ্টার কৌশলকে, যাঁহার কৌশলে স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষ অঙ্গে পরিণত হয়। হজরত বড়পীর তাঁহার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া কহিলেন, হে গুণবতী রমণী! তোমার পুণ্যহগুণেই স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষ অঙ্গে পরিণত হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদ করি এই বালক কালে সাধু পুরুষ হইয়া জগতের লোককে সৎপথে চালাইয়া পুণ্যবান করিবে এবং ইহার সেথল শেখ সাহাবদ্দিন * নাম রাখিলাম, যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করে অবশেষে স্ত্রীলোকটী পীর সাহেবকে সালাম করিয়া ছেলেটীকে

* সাহাবদ্দিন একপিয়ালা দুগ্ধ লইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে পান করাইয়া ছিলেন।

সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ি ফিরে আইল। মেয়েছেলে লইয়া গিয়া বেটাছেলে সঙ্গে আনিল, তাহা দেখিয়া তাহার স্বামী মহাম্মদ আব্দোল্যা সহরদর্দ্দি অতি আশ্চর্য্য হইয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মেয়েছেলেটী বেটাছেলে হইল কি প্রকার। তখন তাঁহার গুণবতী রমণী স্বামীকে বড় পীরের আশ্চর্য্য বা অলৌকিক ঘটনা সমুদয় শুনইয়া দিলেন।

কথিত আছে হজরত শেখ সাহাবদ্দিন সহরদর্দ্দি রহমাতুল্যার বয়সকালে স্তন দুইটী বৃহৎ লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িল তজ্জন্য তিনি দুই দিকের দুইটী স্কন্ধে স্তন ঝুলাইয়া দিতেন এবং মস্তকের লম্বা কেশে তাহা ঢাকিয়া রাখিত। কালে ইনি এমন বিদ্বান হইয়াছিলেন যে, মুখে মুখে আরবী ও পারসী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। অনেক গুলি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুপ্ত-তত্ত্ব বা সাধুতা দেখিয়া শত শত বিদ্বান মণ্ডলী পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহার কাছে অনুস্মরণ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার কয়েক জন বিদ্যান তপস্বী শিষ্যের নাম প্রচার করিলাম। শেখ বাহাউদ্দিন, জাকরিয়া মুলতানি, কাজি হামিদদ্দিন, নাগুরি, মসলেহদ্দিন, শেখ সাদি সেরাজি যিনি পারস্য ভাষায় গোলেস্থান নামক গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন, ইনিও সাহাবদ্দিন রহমাতুল্যার শিষ্য ছিলেন।

এই সাধু পুরুষের বংশ মহামহা তাপসিক ঋষিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত পাঠক ইচ্ছা করিলে অন্যসময়ে শুনাইতে পারি।

বড়পীরের কৃপায় বিংশতি জন স্ত্রীলোক পুরুষ অঙ্গ প্রাপ্ত হয় তাহার বিবরণ।

রেসালাত আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বোগদাদ নগরে একটী লোকের স্ত্রী ক্রমে ক্রমে কুড়িটী কন্যা প্রসব করিল। পত্নীকে কেবল মেয়েছেলে প্রসব করিতে দেখিয়া তাহার স্বামী অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়া কোন ছেলেরি বিবাহ দিলেন না, সকল মেয়ে গুলি ঘরে রহিয়া গেল এবং পত্নীর কেবল মেয়েছেলে হওয়াতে বিরক্ত হইয়া, মনে মনে ধারণা করিলেন যে, এমন মেয়ে প্রসব করা স্ত্রী রাখিলে আমার হাড়েও লক্ষী জুটিবে না আর বেটারও মুখ দেখিতে পাইব না, বৃদ্ধ হইলে উপার্জ্জন বিহনে দুর্দ্দশার একশেষ হইবে, বরং উহাকে (তালাক) ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, হয়ত তাহার গর্ভে পুত্রও হইতে পারে। তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা করাতে, চতুরা রমণী পতির মনগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, বড়ই

দুঃখিত হইল যে, হায়। বৃদ্ধ বয়সে স্বামী আমাকে ত্যাগ করিবেন, লোকেইবা বলিবে কি? স্বামীওত নিতান্ত নির্ব্বোধের প্রায়, বরাত ভাবিল না, আমার প্রতি রুষ্ট। এখন করি কি; এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া অবশেষে বড়পীরের নিকটে যাইয়া মনদুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, হুজুর দাসীর মনের কষ্ট একটু মন দিয়া শ্রবণ করুন। বড়পীর কহিলেন, কি বাছা। তোমার হইয়াছে কি? মনের কষ্টই বা কি জন্য; আচ্ছা বল উপায় থাকে উপকারের চেষ্টা পাইব। তখন স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করিল, গুণময় হুজুর পীরসাহেব। আমার গর্ভে কুড়িটী মেয়েছেলে হওয়াতে আমার স্বামী, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে বিনাদোষে (তালাক) দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখুন তাহা হইলে আমার এই বৃদ্ধ বয়েসে উপায় কি হইবে। অতএব আপনি যদি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া, খোদাতায়ালার নিকটে দোওা করেন, যাহাতে আমার একটী পুত্র সন্তান হয়। তাহা হইলে আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ না করিয়া সরল মনে আমাকে লয়ে সহবাস করেন এবং জালেম নিষ্ঠুর স্বামীর কোপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই। তাঁহার কান্নাকাটী দেখিয়া গুণময় পীর দস্তগীর বলিলেন, যাও, আর চিন্তা করিতে হইবেনা,

নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমার পুত্র হইবে, তোমার স্বামীও তোমাকে আর কখনও ত্যাগ করিবে না। স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক অজ্ঞ, সহজেই সকল কথায় প্রত্যয় করে না এ জন্য বড়পীরের কথা শুনিয়া মনের মধ্যে দ্বিধা করিতে লাগিল, মনে মনে ও এ কথা বলিতে লাগিল, হায়রে কপাল। পীর সাহেবত খোদাতায়ালার নিকট আমার জন্য কিছুই দোওা করিলেন না, একটা কবজ লিখিয়াও দিলেন না, তবে কেমন করিয়া বলিলেন তোমার পুত্র হইবে, বোধ হয় এ কেবল মন রাখা কথা বলিয়া বিদায় করিতেছেন। আদর্শ হজরত বড়পীর সাহেব স্ত্রীলোকটীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে পুত্র কাঙ্গালিনী। বৃথা চিন্তা করিতেছ কেন? এখনই গৃহে গিয়া দেখিতে পাইবে যে, তোমার বিংশতিটী কন্যা পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তখনই বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। বিধির কি অপূর্ব্ব মহিমা, স্ত্রীলোকটী বাটীতে আসিয়া দেখিল যে, সত্য সত্যই সমস্ত কন্যা পুত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কত কি চিন্তা করিতেছে। তখন সেই রমণীটী পতি ও পুত্রদিগকে বড়পীরের কেরামতের বিষয় একে একে অবগত করাইলেন, অবশেষে পতি পত্নী পুত্রসহ দয়াময় বিশ্বপালক খোদাতায়ালার ধন্যবাদ করিয়া, আনন্দ মনে

উভয়ে মিলে বড়পীরের গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইল, নিম্নে তাহা অনুবাদ করিলাম

তুমি পীর দস্তগীর দয়ার আঁধার।
নিরূপায় রক্ষা পায় নামেতে তোমার॥
ছিলাম দুঃখী হলাম সুখী তব গুণে।
কর ত্রাণ দিয়ে স্থান ও রাঙ্গা চরণে।

বড়পীর সাহেব একটী লোককে সাধুত্ব দান করেন তাহার বিবরণ।

খোলাছাতল মোফাখারিন গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল হোসেন বেন আহাম্মদ রহমাতুল্যা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় হজরত শেখ আব্দোর রহমান বোগদাদী (রঃ) শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সেই মুমূর্ষু কালে পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র! আমার অন্তিম কালের পরে, তুমি হজরত বড়পীরের স্মরণাগত হইও এবং তাঁহার নিকটে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করিবে। কেননা তাঁহার শিক্ষাগুণে তুমি সাধুত্ব লাভ করিয়া পরকালে সদ্‌গতি লাভ করিতে পারিবে। অতএব আব্দোর রহমানের পরলোক গমনের

পরে, তাঁহার পুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে হজরত মহবুবে সোবহানির আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইল। তিনিও তাঁহাকে আদর করিয়া সাহানা পরিচ্ছদ পরাইয়া, রত্ন খচিত মনোহর কক্ষে স্থান দিয়া অতি যত্নে রাখিলেন। একদিন পরলোক গত আব্দোর রহমানের পুত্র সেই সাহানা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মাদরাসায় পড়া দিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় একজন মজ্জুব সাধু পুরুষ আসিয়া তাঁহার সাহানা পরিচ্ছদে হস্ত দিয়া বলিলেন, বাপুহে! তোমার এই পরিচ্ছদটী বাদসা, উজির ও ধনবান আমির লোকের যোগ্য, ইহা তোমার অঙ্গে শোভা পায় না, তোমার এই পরিচ্ছদে জগতের লোক ভুলিবে বটে, কিন্তু জগত পতি খোদাতায়ালা ভুলিবেন না। আর একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমার পিতৃদেব মৃত্যু সময় বড়পীরের স্মরণাগত কেন হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন; সাধুত্বলাভ করিয়া খোদা প্রাপ্তি হইবে বলিয়া নয়! এখন তোমার খোদা প্রাপ্তির সংকল্পই বা কোথা, আর সাধুর পরিচ্ছদই বা কোথা? এই কি সাধুর বেশ ভূষা না তপস্বীগণের রীতি নীতি? হে মূঢ়নর! দিন কয়েক মধ্যেই মহা মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া সকল ভুলিয়া গেলে; ধিক, শতধিক! এমন ছার মানব জীবনে ধিক। এই বলিয়া মজ্জুব ফকির

লোক লোচনের অগোচর হইয়া গেল। ফকিরের তীব্র উপদেশে যুবক সাহানা পরিচ্ছদ অঙ্গ হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইল্লাল্লা বলিয়া একটী শব্দ করিয়া বন জঙ্গল দিকে ছুটিয়া গেল। যুবকের এরূপ হঠাৎ ভাব দেখিয়া অনেক লোকেই ভাবা চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইল, মাঠ, ময়দান, বন, জঙ্গল, নিবিড় অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিল, কোথায়ও তাঁহার দেখা পাইল না। অবশেষে হতাশ অন্তরে ফিরিয়া আসিয়া বড়পীরের নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তিনি অগ্রে হইতেই (কস্‌ফে) ধ্যান-যোগে জানিতে পারিয়া ছিলেন; পরে গ্রামবাসী লোক-দের মুখে শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, সেই যুবকটী খোদাপ্রেমে মত্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছে অষ্টাবিংশতি দিবস মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তোমরা ঐ দিবসে নিবিড় বনের অদূরে আইয়াদান নদীর তীরে দাঁড়াইলেই দেখিতে পাইবে। কেনন' তিনি প্রত্যহ সেইখানে অবগাহন ও অজু করিতে আসিয়া থাকেন, যখন তোমাদের সহিত তাঁহার দেখা হইবে তখন তিনি আর কোথাও না পলায়ন করিয়া, অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবেন। গ্রাম-বাসীগণ সেইদিন হইতে দিন গণনা করিয়া আসিতে

লাগিল, দেখিতে দেখিতে শাতাস দিবস গত হইয়া গেল, বড়পীরের আদেশ মত তাহারা ঐ দিনের দিন নিবিড় বনে গিয়া দেখিল যে, সেই যুবকটী জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় চর্ম্ম-পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, ইল্লাল্লা ধ্বনিতে বন জঙ্গল কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহার সেই পবিত্র ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, বিহঙ্গম ও পশুগণে চীৎকার করিতেছে। সে সময় কি মনোহর দৃশ্য বিভু প্রেমে মত্ত হইয়া হিংস্রক জন্তুগণ হিংসা ত্যাগ করিয়া বন্ধুত্ব ভাবে একত্রিত হইয়া সেই যুবক যোগীবরের চতুষ্পার্শে আনন্দে নৃত্য করি-তেছে; তিনিও ইল্লাল্লা শব্দে বনভূমি কাঁপাইতে কাঁপাইতে নদীর দিকে চলিয়া যাইতেছেন। এমনি এস্কে এলাহীতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, ইল্লাল্লা বলিতে বলিতে প্রসান্তভূমীর ন্যায় এককালে নদী পার হইয়া আগুন্তুক দিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল (*)। যখন

(*) ঈশ্বরোন্মত্ত বাহ্যিক নদীতো সহজেই পার হইতেই পারে। যে ব্যক্তি হৃদয় রাজ্যের এই কয়টী নদী পার হইবার উপায় করিয়া রাখে তাহার আবার অসাধ্য কি? যথা;—আশক্তি নদী, বিষাদ নদী, শোক নদী, ঔদাসিন নদী, বিচ্ছেদ নদী, বিপদ নদী ইত্যাদি সমুদয় নদীগুলি পারাপার হইতে তরী ঘাটে রাখিয়াছেন, তাঁহার সকল নদী হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অতি সহজ। ইহাই প্রকৃত মারফতের পার ঘাট, যথা;—যিনি নির্ভরের নৌকায় আরোহণ করেন তিনি আশক্তি নদী পার হইয়া বিষয়

আগন্তুকের গ্রামবাসীদের উপর দৃষ্টি পড়িল অমনি ইল্লাল্লা শব্দ কোথায় লীন হইয়া গেল; পরক্ষণেই বলিলেন, তোমরা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছ? বুঝিয়াছি আমার আশ্রয়দাতা বড়পীর সাহেব তোমা-দিগকে পাঠাইয়াছেন, চল এখনই তোমাদের সঙ্গে পীর-দরবারে যাইতে প্রস্তুত আছি। তখনই গ্রামবাসীদের সমভিব্যাহারে আসিয়া, হজরত বড়পীরের চরণে বারবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। হজরত বড়পীর সাহেব তখন তাঁহাকে সাধুর উপযুক্ত মনে করিয়া চর্ম্ম পরিচ্ছদ উন্মোচন করতঃ পীর পরিচ্ছদ আপন হস্তে পরাইয়া দিলেন এবং গুপ্ত-তত্ত্ব অবগত করাইয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি সন্তোষ তরণীতে আরোহণ করেন, তিনি বিষাদ নদী পার হইয়া শান্তি তটে সমাগত হইয়া থাকেন। তৃতীয় যে জন ধৈর্য্যপোতে আরূঢ় হন তিনি লোভ সাগর পার হইয়া বৈরাগ্য কূলে উপস্থিত হন। চতুর্থ যিনি বৈরাগ্য তরীতে আরোহণ করেন, তিনি ঔদাসিন্য সরিৎ পার হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের তটে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। পঞ্চম যিনি একেশ্বরবাদের নৌকায় সমারূঢ় হন, তিনি ভিন্নতার স্রোতস্বতী অতিক্রম করিয়া যোগের ভূমিতে আসিয়া পৌছেন যষ্ঠ যে লোক সহিষ্ণুতার,তরণীতে আরোহণ করেন, তিনি সকল বিপদ সাগর পারাপার হইয়া এবং বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া নিষ্কণ্টক ভূমিতে বাস করিয়া যোগ সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন।

একজন ঈশ্বরাশক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধু পুরুষের বিবরণ।

মোনাকাব গোওসি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ মহাম্মদ আব্দোল্যা আনসারি রহমাতুল্যা আলায়হে হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন হজরত আব্দোল কাদের জিলানী বড়পীর সাহেব সৈয়দ আহাম্মদ নামক একজন ঈশ্বর প্রেমিক সাধু পুরুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এক টুক্‌রা কাগজে এই বচনটী লিখিয়া পাঠাইলেন, "আল এস্‌কো" ইহা কি প্রকার বস্তু। ভৃত্য সেই কাগজ টুক্‌রাটী লইয়া চলিয়া গেল, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, একজন অনাহারী ক্লান্ত দীন হীন প্রেমোন্মত্ত সাধু পুরুষ বৃক্ষতলে বসিয়া (তসবি) মালা জপ করিতেছেন। ভৃত্য অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে লিপিবদ্ধ কাগজটী দান করিল। মহর্ষি সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব বড়পীরের হস্তলিপিতে বার বার চুম্বন করিয়া পাঠ সমার্পন পূর্ব্বক বলিলেন, "আল এস্‌কে নারোন ইয়াহ্‌রোকো মাসাবিল্লাহে" অর্থাৎ আসক অগ্নির সমতুল্য অন্য অগ্নি নাই এবং ঐ অগ্নিতে আল্লা ব্যতীত সমুদয় বস্তু জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেয়। যখন তিনি বড়পীরের পবিত্র বচনের অর্থ করিলেন, তখনি এসম আজমের

অগ্নিময় তেজে বৃক্ষটী পুড়িয়া আবার মহর্ষি সৈয়দ সাহেব দেখিতে দেখিতে আঁখির পলকে ভস্ম হইয়া গেলেন, তাঁহার পবিত্র আত্মার ছাই ভস্ম ক্রমাগত জলে জলময় হইয়া পুনরায় বরফের ন্যায় জমিয়া রহিল। ভৃত্যটী এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বড়পীরের নিকটে ছুটিয়া গেল। পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সৈয়দ আহম্মদ সাহেবের অকস্মাৎ যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সমুদয় শুনাইয়া দিল। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বরফের উপর হস্ত রাখিয়া একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "আলমসে ছুরাত জেসমানি" অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি ধারণ কর। ইহা বলামাত্র সৈয়দ সাহেব মহাবচন (কলেমা) পাঠ করিতে করিতে যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহাকে গুপ্তবিদ্যায় দীক্ষিত করিলেন।

বড়পীর আবুবকর হামামির কাওালী গাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার ফকিরি কাড়িয়া লয় তাহার বিবরণ।

গোলজার মানি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল হোসেন বেন আবুল কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন যে,

শেখ আবু বকর হামামি গুপ্ত বিদ্যায় মহা পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু সদা সর্ব্বদা সামা কাওয়ালী গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সামা কাওয়ালীর প্রতি এতদূর সখ অনুরাগ ছিল যে, প্রায় লোক দেখিলেই কাওয়ালী গাহিত। তাহার এ রকম মন্দ স্বভাব দেখিয়া, হজরত বড়পীর সাহেব প্রায় তাহাকে সামা গাহিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু আবুবকর হামামি সে কথায় কর্ণপাত করিত না, কু-প্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়িয়া, বড়পীরের কথা অমান্য করিয়া নিজে অভিষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য গুরুজনের কথায় ভ্রুক্ষেপও করিল না। কেবল সামা কাওয়ালী গাহিয়া আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন হজরত বড়পীর সাহেব জামে মসজিদের মধ্যে আবুবকর হামামিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আবুবকর! তুমি সামা গাহিয়া মহাম্মদি সরিয়তের উপর দাগ চড়াইতেছ? হজরত মহাম্মদ (সঃ) যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা করিয়া কেন বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছ; এখনও বল্‌চি উহা ত্যাগ কর, নতুবা তোমার ফকিরি নষ্ট করিয়া দিব। লোকের যখন মতিচ্ছন্ন কুমতি ধরে, তখন সাধুগণের সদ্ উপদেশ ত্যাগ করিয়া অমূল্য ধন হারাইয়া বসে। বড়পীরের কথা যখন একবারেই অগ্রাহ্য করিল, তখন তিনি তাহার গুপ্ত-বিদ্যা অমূল্যধন ফকিরি কাড়িয়া নিলেন। তাহার

ফকিরি গৌরব, আস্পর্দ্ধা ও অভিমান সকলই চূর্ণ হইয়া গেল। হীনাবস্থায় বোগ্‌দাদ ছাড়িয়া ফাজাফ দেশাভিমুখে গমন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া রক্ষা পাইল। কিন্তু সে সহর মধ্যে যাইয়াও সামা ত্যাগ করিল না, একদিন একস্থানে বহু লোকের ভিড় দেখিয়া সামা-কাওয়ালী গাহিবার জন্য যেমন সুর ধরিল, অমনি বড়পীরের অভিসাপাস্তরে মূর্চ্ছা হইয়া ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল, বাকরোধ হইয়া গেল, তখন নিজের কৃত কার্য্যের প্রতিফল মনে করিয়া, সামা কাওয়ালী গাওয়া ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল অর্থাৎ তওবা করিয়া পবিত্র হইল। সেই রাত্রেই হজরত মহাম্মদ (সঃ) হজরত বড়পীর সাহেবকে স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন, হে প্রিয়পুত্র আব্‌দোল কাদের জিলানী! আবুবকর যেমন আমার সরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিল, তেমনি তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। এখন তিনি সরল মনে সে কার্য্য (তওবা) ত্যাগ করিয়াছে, সে জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম এবং তুমিও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাহার ফকিরি (সাধুত্ব) ফিরাইয়া দাও। হজরত বড়পীর রজনীযোগে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দরবারের দ্বারে আবুবকারকে দেখিতে পাইলেন। আবুবকর অমনি পীরের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা

ভিক্ষা চাহিল। বড়পীর তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় তাহাকে দ্বিগুণ বিদ্যায় বিদ্যান করিয়া কামেল ফকির করিয়া দিলেন। অতএব হে পাঠকগং! ভাবিয়া দেখুন সামা কাওয়ালী গীত বাদ্য কতদুর ঘৃণিত কার্য্য, যাহার জন্য মহাসাধক পুরুষের এরূপ কঠিন শাস্তি পাইতে হইল, তবে কি বুঝিয়া আজকালের ভণ্ড ফকিরেরা গীত বাদ্যে, সামা কাওয়ালীতে আনন্দ কবিয়া থাকে। যাহারা বাহ্যিক আনন্দে নিমগ্ন তাহারা কেমন করিয়া সাধুত্ব লাভ করিতে পারিবে। যিনি সাধকদিগের পরম গুরু হজরত বড়পীর তাহারও সামা কাওয়ালীর প্রতি বিদ্বেষ। তবে যাহারা ফকিরী পথ অবলম্বন কবিয়াছে সত্বরেই যেন ইহা ত্যাগ করে।

খাজা মইনদ্দিন চিস্তি ও বক্তিয়ার কাকির সামার বিবরণ।

লাতায়ে ও গরায়েব এবং অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত আছে, যখন খাজা কোতোবদ্দিন বক্তিয়াব কাকি (রঃ) বয়স ত্রয়োদশ বৎসর তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হজরত খাজা মইনদ্দিন চিস্তি আজমেরী বোগ্দাদ শরিফে যাইয়া বড়পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বড়পীর সাহেব খাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার

সঙ্গে এ বালকটী কে? তিনি কহিলেন, ইহার নাম কোতোবদ্দিন; ইনি বাল্যকালেই আমার হস্তে মুরিদ হইয়াছে এবং আমিও ইহাকে অধিক ভাল বাসিয়া থাকি। তখন তিনি বালকের মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করি প্রধান সাধুত্ব লাভ করিও, পরে খাজা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাব এই শিষ্যটী ভবিষ্যতে মহা সাধুপুরুষ হইয়া দিল্লীর মধ্যে বাস করিবে। ফলে বড়পীর সাহেবের আশীর্ব্বাদে কোতোবদ্দিন এমন সাধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, কুদরতী কাঁক হইতে লক্ষ লক্ষ লোককে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করাইতেন। একদিন খাজা সাহেব চঞ্চল মনে ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বড়পীর সাহেব বলিলেন, ভ্রাত! আজ কেন তোমার এত চঞ্চলা স্বভাব? তখন তিনি বলিলেন, আপনিত আমাব স্বভাব জানেন, সামার সভা না করিলে নিশ্চিন্ত হইয়া একস্থানে বেশী দিন কাল কাটাইতে পারি না। তখন তিনি বলিলেন, ভ্রাত খাজা মইনদ্দিন! আমি সামা শুনিতে তত ভাল বাসিনা, তবে কেবলমাত্র তোমারি জন্য সামা গাহিতে আদেশ দিলাম। রাত্রিকালে সাধু ও বন্ধু বান্ধবগণে সভা করিয়া বসিলেন, সম্পূর্ণ মজলিসে খাজা মইনদ্দিন চিস্তি আরব্য ভাষায় সামা অর্থাৎ এই পদ্যটী পাঠ করিতে লাগিল।

আন রসুলোল্লাহু আদরুনি।
ওালয়াফু এন্‌দা রসুলোল্লাহ্‌ মামুলে ॥
নিশ্চয় রসুলোল্লা পুরুষ পবিত্র।
ক্ষমাকারী গুন তাঁর এই একমাত্র।

খাজা সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সামা পাঠ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বড়পীর সহেব ধরাতলে যষ্টিদ্বারায় ঠেক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে দাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিতেছিল এবং ঘর্ম্মে সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। পরে যখন সভা ভঙ্গ হয়, কেহ পীরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর! যখন খাজা সাহেব সামা পাঠ করিলেন, তখন আপনি মৃত্তিকায় আসাব ঠেক দিয়া দাবিয়া ধরিয়াছিলেন কেন। তখন তিনি বলিলেন, এই আসাবাড়ীতে পৃথিবী দাবিয়া না ধরিলে নিশ্চয় খাজা সাহেবের সামার মহিনী শক্তিতে ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া যাইত। পাঠকগণ! বুঝিয়া দেখুন, সামা কাহাকে বলে। আজকাল অনেক ভুগুলে ফকির বলিয়া থাকে, চিশ্‌তিয়া তরিকাতে সামা, কাওয়ালী, গীত বাদ্যের প্রথা আছে। ইহা বলা তাহাদের অলীক; সম্পূর্ণ মিথ্যা, সামা কাওয়ালী গীত বাদ্য ইহা সকলই হারাম।

যেমন সায়েরল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,

সোলতানল মসায়েখ নেজামদ্দিন চিশ্‌তি রহমাতুল্যা আলায়হে বলিয়াছেন যে (১); সামা চার প্রকার যথা, হারাম, মকরু, মোবাহ্, হালাল? হারাম ঐ লোকের জন্য যাহারা সামার স্বরে মগ্ন হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি আশক্ত হয়, মকরু ঐ লোকের জন্য যাহারা কথন কথন খোদাকে স্মরণ করে, মোবাহ্ উহার জন্য যাহারা বাহ্যিক আমোদ প্রিয় নয় এবং সদা সর্ব্বদা খোদাপ্রেমে আশক্ত, হালাল ঐ সাধুপুরুষদিগের জন্য, যাঁহারা এস্কে এলাহিতে ডুবিয়া আছেন এবং যাঁহারা প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে খোদাতায়ালার নাম স্মরণ করিতে থাকেন, এবং ছয়টী লতিফা হইতে আল্লা আল্লা শব্দ উচ্চারণ হয়, একদমের জন্যও খোদার নাম হইতে বিস্মরণ হয় না। এরূপপ্রকার চিশ্‌তিয়া তরিকের ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত সাধু লোকের জন্য কেবল মাত্র সামা কাওয়ালী করা শুদ্ধ আছে, কিন্তু অন্য কোন তরিকার মধ্যে কোন লোকের জন্য শুদ্ধ নাই। তবে যাহারা কেবল সামায় নিমগ্ন হইয়া আমোদ প্রিয় হয়, গীতবাদ্য করে এক সভায় স্ত্রীপুরুষে আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে, খোদাপ্রেমে তত আশক্ত নয়, রোজা নামাজ ত্যাগ করিয়া, সমস্ত রজনী সামা কাওয়ালী গাহিয়া বাহ্যিক

(১) এই সাধুপুরুষের সমাধি (কবর) জিয়ারত করিলে একটী হজ্বের পুণ্যাহ পাওয়া যায়।

সাধুতার আড়ম্বর দেখাইয়া মূর্খলোকদিগকে কুপথগামী করাইয়া ফিরে। আর মুখে বলে আমরা চিশ্‌তিয়া, সামা কাওয়ালী করিয়া বেড়াইব আমাদের নামাজ রোজায় আবশ্যক নাই, ইহা এক প্রকার ভিন্ন পথ তাহারা সামরানিয়াদল কিন্তু চিশ্‌তি তরিকার প্রধান পীর গুরু খাজা কোতোবদ্দিন বক্তিয়ার কাকি চিশ্‌তি রহমাতুল্যা আলায়হে সামা পাঠ করিতেন ও নামাজ পড়িয়া সরিয়তের আজ্ঞা পালন করিতেন।

ফাওাদল সালেকিন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন খাজা বক্তিয়ার কাকি (রঃ) খোদাপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া (সামা) এই পদ্যটী পাঠ করিয়াছিলেন ;—

বয়েত।

সরুদ চেশ্‌ত কে চঁন্দে ফস্থঁ আশক দোরস্ত্‌।
সরুদ মহরম আশক এস্ত্‌ ও আশকে মহরামাস্ত্‌॥

তিনি এই সামা বয়েতটী পাঠ কবিয়া অনাহারে সপ্তদিন পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু উপাসনার সময় কালিন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নামাজ পড়িয়া লইতেন। সপ্তদিন খোদাপ্রেমে বা এলাহী এস্কে নিমগ্ন হইয়া, অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পঞ্চমীত সময়ের নামাজ উপাসনা ত্যাগ করেন নাই। কেননা

বন্ধুর আদেশ পালন বন্ধুতেই করিয়া থাকে, তজ্জন্য পঞ্চম ওক্তের নামাজ সহস্র বিপদে পড়িয়াও তাহা কোন দিনের জন্যও ত্যাগ করেন নাই।

জামেওল কলম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন খাজা কোতবদ্দিন, শেখ ফরিউদ্দিন, কাজীহামিদদ্দিন নাগরী, শেখ হানিফ তবরেজী, এরূপপ্রকার সাধু ও বিদ্যান মণ্ডলীগণ প্রায় সহস্র লোক ছিল। সেই সভায় খাজা কোতবদ্দিন কাকি সাহেব নাচিতে নাচিতে সামা পাঠ করিলেন। সে সময় সকল লোক, অজ্ঞান হইয়া কাকি সাহেরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ইহাতে তিনি অসন্তোষ হইয়া ইসারায় ফরিউদ্দিন গঞ্জেসকরকে বলিলেন, ইহাদের শিরশ্ছেদন কর? তখন ফরিউদ্দিন সকলকে ভীমনাদে কহিলেন, হে ধূলায় লুণ্ঠিত ব্যক্তিগণ! তোমরা শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া পড়, নতুবা তোমাদের এখনই গর্দ্দান যাইবে। তখন পিরের চরণতল হইতে সকলেই উঠিয়া পড়িল। খাজা কাকি সাহেব সামা পাঠ করিয়া খোদাপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশবার ভূমিষ্ঠ হইয়া স্থষ্টি-কর্ত্তা দয়াময়কে সেজ্‌দা করিয়াছিলেন। সালেকিন গ্রন্থে লিখিত আছে, চিশ্‌তিয়া তরিকাতে সামায় দুইটী নিয়ম আছে; প্রথম নিয়ম নামাজ সমাধা করা, দ্বিতীয় নিয়ম নামাজ পড়িবার সময় জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, আবশ্যক। আর

শ্রোতার জন্য নিজের কু-ইচ্ছাকে ত্যাগ করা, কেবল খোদাপ্রেমে এস্কে এলাহীতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখে। অতএব যে যাহা করিয়া থাকে তাহা যেন বিশ্ব-পালকের সন্তোষের জন্য হয় তাহাতে নিজের কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য এমন কোনরূপ ভণ্ডামি তিলার্দ্ধ না প্রকাশ পায়।

বড়পীর সাহেব বোগদাদের বাদশাকে স্বর্গীয় সেব ফল ভক্ষণ করিতে দেন তাহার বিবরণ।

গোলজারসানি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুল মোফাখার হোসনি বোগদাদি হইতে বর্ণীত হইয়াছে যে, একদিন বোগদাদ অধিপতি সম্রাট বাদশা জাঁহাপনা মনে মনে বড়পীর সম্বন্ধে কত কি আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ইনি যদি আমাকে কোন কেরামত আশ্চর্য্য বিষয় দেখাইতে পারেন তাহা হইলে পীরসাহেবের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইব। মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া যখন পীর দরবারে উপস্থিত হইলেন; তখন পীরগুণধরের তাঁহার মনোভাব অবগত হইতে আর বাকী রহিল না। সম্রাটকে দেখিবামাত্র

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বোগদাদাধিপতি! আপনি কি কোন বিষয়ের কেরামত দেখিবার ইচ্ছা করেন। তখন সম্রাট একটু অপদস্থ হইয়া নম্রতাভাবে কহিলেন, মহাত্মন! এসময় কোথায়ও সেব ফল পাওয়া যায়না, আপনি এক-জোড়া স্বর্গীয় টাট্‌কা সেব আমাকে স্বর্গ হইতে আনিয়া দিউন। বড়পীর সাহেব সম্রাটের মনো আশা পূর্ণ করিতে ধ্যানযোগে স্বর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একজোড়া টাট্‌কা সেব একস্থানে ধরা আছে। হজরত সেই ফল জোড়া প্রার্থনা করিতেই স্বর্গীয় দূতের দ্বারায় অদৃশ্য ভাবে আসিয়া পৌঁছিল। আপনি একটী লইয়া অপরটী বাদশার হস্তে প্রদান করিলেন। হজরত আপনি যে ফলটী রাখিয়াছিলেন তাহা ছেদন করিয়া আপনি ভক্ষণ করিলেন, আর সহচর দিগকেও খাইতে দিলেন; তাহার সৌগন্ধে দরবার মগ্ন হইয়া গেল, ফলের আস্বাদনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল। বাদ্‌শাহ্‌ যে ফলটীকে লইয়াছিলেন তাহা নিজের হস্তে তখনই কর্ত্তন করিলেন, তাহার ভিতরে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইল, ইহা দেখিয়া সম্রাট তাজ্জব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আমার এই ফলটী এরূপ দুর্গন্ধ হইল কেন? তখন তিনি বলিলেন, হে বাদশা নামদার! এ স্বর্গীয় সেব উত্তম, তবে তোমার মনের কৌশলে কু প্রবৃত্তিরদোষে ও

অপবিত্র হস্তের স্পর্শে উহা নষ্ট হইয়া দুর্গন্ধে পরিণত হইয়াছে। তুমি একজন সম্রাজ্যশালী বোগদাদ সহরের সম্রাট! আপনি যদি সত্য বিচার ও প্রজার প্রতি দয়া, কি তাহাদের প্রতি দান খায়রাত করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনি স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ করিতে পাইতেন। সৎকার্য্য না করিয়া, তবে আপনি কেমন করিয়া স্বর্গীয ফল খাইতে পাইবেন। জগতে যাঁহারা সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যবান ধার্ম্মিক হইবেন তাঁহারাই পরকালে স্বর্গীয় সুখাদ্য ফল খাইতে পাইবেন, উহাতে পাপীর কোন অধিকার নাই। বড়পীর সাহেবের এই মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণে জর্জ্জরিভুত হইয়া বিষণ্ণ বদনে সম্রাট সেখান হইতে তখনই উঠিয়া গেলেন পাঠক বুঝিয়া দেখুন, কি ধনি কি আমির কি গরিব কি নির্ব্বোধ কি জ্ঞানবান কি বিদ্যান কি মূর্খ কি রাজা কি প্রজা কি সাধু কি অসাধু সৎকর্ম্ম ব্যতীত কেহই কখন স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, এইটী বিধির বিধান, কর্ম্মের মত ফল।

বড়পীরের হস্ত স্পর্শে স্বর্ণ মোহর রক্তময় হয়।

খোলাসাতল কাদরি নামক গ্রন্থে মনসালেথ হইতে বর্ণিত আছে, অপর এক সময় মনসুরের পুত্র ইউসুফ

বোগদাদাধিপতি একতোড়া (আসরাফ) স্বর্ণ মোহর হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জিলানি বড়পীর সাহেবকে নজরানা উপহার পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বাদশা প্রদত্ত স্বর্ণ মোহর লইতে স্বীকৃত হইলেন না, তবে রাজ মন্ত্রির অনুরোধে তোড়াটী হাতে লইয়া, দুই হস্তে মর্দ্দন করিলেন। যখন হজরত মোহর গুলি হস্তের দ্বারায় মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই মোহর হইতে টাটকা রক্ত পড়িতে লাগিল, কেবলমাত্র কয়েকটী স্বর্ণ মোহর হইতে রক্ত বাহির হইল না এবং তাহা ভিন্ন সকল মোহর গুলিই রক্তময় হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া সভাসদ্ ও রাজমন্ত্রি আশ্চর্য্য হইয়া তখনই সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। বাদশা সংবাদ পাইয়া তখনই পীর দরবারে আসিয়া হাজির হইলেন এবং প্রদত্ত স্বর্ণ মোহর গুলি রক্তময় দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন! স্বর্ণ মোহর হইতে রক্ত নির্গত হইল ইহার কারণ কি? যাহা কর্ণেও শুনিন', চক্ষেও দেখিন', এরূপ' অসম্ভব আশ্চর্য্য ঘটনা কখনই ত ঘটেনা। তখন তিনি বলিলেন, আপনি নিরাশ্রয় অসহায় পিতৃহীন এতিম বালক ও দীন দুঃখি প্রজার প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার করিয়া এই অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেজন্য তাহাদের আর্ত্তনাদ হা

হুতাশ মনস্তাপ প্রত্যেক লোমাবলি শিরায় শিরায় অভি-সম্পাতের রক্ত ঐ স্বর্ণ মোহরে স্থান পাইয়াছে এবং উহা অবৈধ হারামে পরিণত হইয়াছিল। এখন আমার পবিত্র করস্পর্শে যাহা নিরাশ্রয় লোকের অভিসাপের রক্ত, তাহা বহির্গত হইয়া আসলে পরিণত হইল। নিশ্চয় আমার এই বাক্যাবলি বিশ্বাস করিয়া লইবেন, এই বলিয়া তিনি আরবী হাদিসটী উচ্চারণ করিলেন।

"কোল্ল সায়য়েন ইয়ার জেয়ো এলা আছলেহি।" অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে সকলেই যে যাহার আসলে পরিণত হইবে। বাদশা ও মন্ত্রি বড়পীরের মুখে আরবী হাদিসটী শ্রবণ করিয়া, সেই দিন হইতে সতর্ক হইয়া, লোকের প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার না করিয়া সকল প্রজার প্রতি সমান ভাবে দয়া ও দান খায়রাত করিতে লাগিলেন।

বড়পীরের দান করা বস্তু পঞ্চবিংশতি বৎসর এক রকম থাকে তাহার বিবরণ।

তহ্‌ফাতল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত বড়পীর সাহেবের শেখ আবুল আব্বাস নামক একজন অশ্ব পালক, তিনি বড়পীর সাহেবের বড়ই প্রিয়ভক্ত

ছিলেন। হুজুর যখন যাহা, তাহাকে আদেশ করিতেন অশ্ব পালক তখনি তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া দিত। এজন্য পীরসাহেব তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন; এমন কি তাহার বাটীর খাওয়া পড়ার প্রত্যহ সংবাদ লইতেন। এক বৎসর বোগদাদ সহরে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, সেই দুরন্ত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া শত শত অনাহারী ভিক্ষুক দরিদ্র কাঙ্গাল প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। আবুল আব্বাস বলিয়াছেন, আমি সেই দুর্ভিক্ষের হস্তে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম, কখন কখন একসন্ধ্যা খাইয়াও প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছিল। আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পীর-দরবারে যাইয়া হাজির হইলাম; তিনি আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, একটী থলেতে করিয়া একমন গেহু আমাকে দান করিলেন। পরে আমাকে বলিয়াদিলেন আব্বাস! তুমি এই থলের মুখ কখনই খুলিওনা, কেবল মাত্র একটী ছিদ্র রাখিও যখন যেমন যাহা আবশ্যক হইবে, তখন ঐ ছিদ্র দিয়া গেহু বাহির করিয়া লইও, তাহা হইলে উহা কখনই কম হইবে না। আমি পীর-সাহেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম এবং সেই দিন হইতে দয়াময়ের কৃপায় ও পীরের দাতব্য বস্তুর গুণে দুর্ভিক্ষ আর আমার

কিছুই করিতে পারিলনা। আমি থলের ছিদ্র দিয়া গেহু বাহির করিয়া রুটী প্রস্তুত করি, আবার সময়ে সময়ে বাজারে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে হাট বাজার ভরণ পোষণ সকলি করিয়া থাকি। কিন্তু কখনই তাহা হইতে একটু কম বলিয়াও বোধ হইল না, পীরের দাতব্য জিনিষের কি কেরামত পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল প্রায় একরূপেই কাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই বিশ্বপালক খোদাতায়ালার সপথ করিয়া বলিতেছি পঁচিশ বৎসর মধ্যে এক মুষ্টি গেহু কম বলিয়াও বোধ হইল না। পঁচিশ বৎসর পরে একদিন আমার পত্নী ভুল ক্রমে থলেটীর মুখ খুলিয়া গেহু ঢালিয়া লইয়াছিল, সেইদিন হইতেই সকল গেহু ফুরাইয়া গেল।

বড়পীরের নিকটে সয়তানের চাতুরি।

মনাজেল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল কাসেম বোগদাদী হইতে বর্ণীত হইয়াছে যে, একদিন হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জিলানী বড়পীর সাহেব রোমজান মাসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, অদ্যকার উপবাসের সন্ধ্যার আহার স্বর্গীয় আহার্য্য ব্যতীত কখনই এফ্‌তার করিবনা। দেখিতে দেখিতে ভানুদেব সূর্য্য সমস্তদিনের পরে ক্লান্ত হইয়া,

লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া পাটে বসিলেন। তখন হজরত বড়পীর সাহেব নিজের কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন শূন্য হইতে একটী লোক সজ্জিতবেশে হস্তে স্বর্ণ থালে করিয়া নানাপ্রকারের মিষ্টান্ন ও উত্তম উত্তম মেওয়া ফল, রুমালে আচ্ছাদন করিয়া হস্তে লয়ে সম্মুখে আসিয়া রাখিয়াদিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি মেওয়া পূর্ণ স্বর্ণথাল সম্মুখে রাখিয়া কহিল, হুজুর! এ স্বর্গীয় আহার্য্য আপনার (রোজা এফ্‌তার) উপবাস ভোজন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আনিয়াছি। খোদাতায়ালা আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আপনি স্বচ্ছন্দে এফ্‌তার করুন। স্বর্ণথাল দেখিয়া হজরত বড়পীরের মনে একটু সন্দেহ হইবার কারণে, কসূফে ধ্যানে বসিয়া সয়তানের চাতুরি বলিয়া আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন, দূরহ্। সয়তান এব্‌লিস। আমার সঙ্গেও চাতুরি? আমার হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) মের সরিয়তের আদেশানুযায়ী রৌপ্য ও স্বর্ণের থালে আহার করা ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পুরুষকে পরিধান করা অবৈধ হারাম। পাপাত্মা! এতদুর আস্পর্দ্ধা আমার সঙ্গে ছল চাতুরি; মনে করেছ কি? একি আদি পুরুষ আদম (আঃ)

কে পাইয়াছ যে, ছলে, কলে, কৌশলে স্বর্গচ্যুত করাইব? দুরাত্মা সেই দিনের দুর্দ্দশার কথা কি মনেও নাই, যে দিন দৈবহস্তের মার খাইতে খাইতে পলায়ন করিয়াছিলি। মহাপাপী শয়তান দেখিল যে, আমাকে চিনিয়া লইয়াছে, আর চাতুরী খাটিবেনা, অমনি চক্ষের পলক মারিতে না মারিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। এদিকে এফ্‌তার করিবার সময় হইলে অকস্মাৎ স্বর্গীয় দূত, স্বর্গীয় আহার্য্য লইয়া বড় পীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহবুবে সোবহানি আব্‌দোল কাদের জিলানী। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি খোদাতায়ালা তোমার প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ করিয়াছেন, এখন উঠ স্বর্গীয় আহার করিয়া রোজা এফ্‌তার কর। হজরত বড়পীর সাহেব আর সময় নষ্ট না করিয়া এফ্‌তার করিলেন, স্বর্গীয় আহার্য্য আহার করিবার পরে একটী দোয়া পড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ শোকর আদায় করিতে লাগিলেন।

বড়পীর সাহেব একদিনে সত্তর স্থানে রোজা এফ্‌তার করেন।

মকা সেফায়ে জনিদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আব্‌দোল কাদের শামি হইতে বর্ণীত হইয়াছে যে, এক

সময় রমজান শরিফের মাসে, এক একজনের অসাক্ষাতে বড়পীর সাহেবকে, একে একে সত্তর জন লোক নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি সকলেরি মন রাখিবার জন্য নিমন্ত্রণ ও আহ্বান স্বীকার করিয়া এবং নিজের আশ্চর্য্য কেরামত গুণে এক মুহূর্ত্তেই সকলের বাটীতে গিয়া রোজা এফ্‌তার অর্থাৎ উপবাস ভোজন করতঃ সকলের মনঃতুষ্টি করিয়া, আবার নিজের বাড়ীতেও শিষ্যগণের সঙ্গে বসিয়া রোজা এফ্‌তার করিলেন। পরদিন সে সকল লোক পরস্পর বলাকহা করিতে লাগিল যে, আজ হজরত বড়পীর সাহেব আমাব বাড়ী এফ্‌তার করিয়াছেন। এইরূপ ক্রমাগত সত্তব জন বলাকহা করাতে, পীরের আশ্চর্য্য কেরামত প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং শিষ্যগণ বা অন্য অন্য লোক সকলেই বিশ্বাস করিল। কিন্তু একটী ভৃত্যের মনে এ কথা প্রত্যয় হইল না; অবিশ্বাসী ভৃত্য কহিল, আচ্ছা ভাই। পীব সাহেবের শবীর হইল একটী। আর সে কেমন করিয়া সত্তর স্থানে এফ্‌তার করিয়াছিলেন। আমিও ত বাটীর মধ্যে পীর সাহেবের সঙ্গে এফ্‌তাব করিয়াছি? তবে কেমন করিয়া তিনি সকলের গৃহে এফ্‌তার করিয়াছিলেন অবিশ্বাসী ভৃত্যের কথা পীরসাহেব অবগত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাকালে একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া তসবী হস্তে জপ করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে ভৃত্যকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে ভৃত্য! তোর মনে আমার সতর স্থানে এফ্‌তার করাতে সন্দেহ হইয়াছে নয়? তা তো হইতেই পারে? একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া এই বৃক্ষটীর শাখা প্রশাখার দিকে লক্ষ করিয়া দেখ দেখি। সে যেই মাত্র চক্ষু তুলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, বড়পীর সাহেব বৃক্ষের শাখা, প্রশাখায়, প্রত্যেক পাতায় পাতায়, পৃথক্ পৃথক্ এক একটি বড়পীর বসিয়া তস্‌বী জপ করিতেছেন এবং বৃক্ষের নিম্নে দৃষ্টি করিতে দেখিতে পাইল যে, স্বাভাবিক ভাবে যেমন বসিয়াছিল সেইরূপ বসিয়া তস্‌বী জপনা করিতেছে। তখন চাকরটীর মনের সন্দেহ দূরে গেল, পীরের চরণ তলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইল। অধম লেখক বলেন, প্রায়ই অজ্ঞ মূর্খ-লোকের মনে আওলিয়ার কেরামত বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকে।

বড়পীরের উপাসনাগুণে শুষ্কবৃক্ষে ফল ধরে।

এগারুই মজ্‌লেস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আলি মহ্‌তি বলিয়াছেন যে, একদিন হজরত আব্‌দোল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব কোথায় গমন করিয়া-

ছিলেন, পথিমধ্যে আসিতে আসিতে উপাসনার সময় উপস্থিত দেখিয়া, আমার বাটীতে পদার্পণ করিলেন। আমি উপাসনা কালিন হজরতকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি করিয়া, ওজুর জল আনিয়া যোগাইলাম? হুজুর আমার একটী শুষ্ক খোরমা—বৃক্ষমূলে ওজু করিয়া, অন্য একটী নিষ্ফলা খর্জ্জুর বৃক্ষতলে নামাজ পড়িয়া সন্ধ্যা আহ্লিক সমাপ্ত করিলেন। সেইদিন হইতেই আমার খোরমা ও খর্জ্জুর বৃক্ষে সম্পূর্ণ ফল ফলিতে লাগিল। এমন কি সেই বৃক্ষ দুইটী হইতে একদিনের তরেও খর্জ্জুর ও খোরমা শেষ পায় না, বারমাসই বৃক্ষ দুইটীতে ফল দিয়া, আমার উন্নতি করিতে লাগিল। আমিও পীরের পুণ্যহ্ ফল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম।

হজরত বড়পীর সাহেবের তপস্যা ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ।

আবুল হোসেন কোতবদ্দিন আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এক সময়ে হজরত বড়পীর সাহেব নির্জ্জন স্থানে একটী পর্ব্বত মধ্যে তপস্যায় মননিবেশ করিলেন; সে তপস্যা ভয়ঙ্কর কঠিন। এককালে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশ বৎসর সাধনা করিতে নিযুক্ত হন। কখন কঠিন ব্রত উদযাপন করিতে একদিন হইতে তিনদিন উপবাস থাকি-

তেন, কখন চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস থাকিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের আরাধনা অর্চ্চনা করিতেন। তথাপি ক্ষুধার জ্বালায় একটুও বিচলিত ভাব হইতেন না। তাঁহার সেই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন ও তপস্যা দেখিয়া বনের পশু পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িত তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে সেই পর্ব্বত মধ্যে তপস্যা করিতে করিতে, দাতাদয়াময় খোদাতায়ালার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আমাকে কেহ মুখে তুলে আহার না করাইলে, আহার করিব না; এবং কেহ জল না পান করাইলে, জল পান করিব না। এইরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া, একমনে একধ্যানে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলাম। দেখিতে দেখিতে ঊনচল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহই আসিয়া আমাকে পান্ আহার করাইল না। চল্লিশ দিবসের দিনে অকস্মাৎ একটী লোক আসিয়া, নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য আমার সম্মুখে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। সম্মুখে আহার্য্য সামগ্রী দেখিয়া, জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষুধাও উত্তেজিত হইয়া, খাও খাও বলিয়া তোষামদ করিতে লাগিল। আবার বলিল, আর কতদিন সহ্য করিয়া থাকিবে, অনাহারে মারা পড়িবে, তোমার কে এমন বন্ধু আছে যে, মুখে তুলে খাওয়াইয়া যাইবে? তখন আমি বলিলাম, রে ক্ষুধা! রে লোভ! ধৈর্য্যা-

বলম্বন কর; আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ? আমি তোমাদের উত্তেজনায় কথনই বিচলিত হইব না। এমন সময় উদর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্ষুধা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, মলাম, মলাম, আবার একদিকে লোভ বলিতেছে, খাই, খাই। কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অটল, অচল ভাবে বসিয়া বিভুপ্রেমে মননিবেশ করিলাম। আবু সইদ (রঃ) সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি রিপুগণের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া, আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সাধু প্রবর! এমন অধৈর্য্য চীৎকার কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, এ আমার ক্ষুধা, লোভ, অধৈর্য্য রিপুগণের আত্মনাদ। কিন্তু আমি, আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে, অটল, অচল, স্থির, ধীর ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া, একমনে একধ্যানে, খোদাপ্রেমে নিমগ্ন আছি। তখন তিনি বলিলেন, হে আবদোল কাদের! তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, তোমাকে আহার করাইয়া দিব; এই বলিয়া তিনি তখনই চলিয়া গেলেন। আমি সে সময় মনে মনে ধারণা করিলাম, খোদাতায়ালার আদেশ ব্যতীত এখান হইতে কথনই উঠিব না। এমন সময় খাজের আলায়হেচ্ছালাম আসিয়া বলিলেন, যাও উঠ! খোদাতায়ালার

আদেশ এইরূপ যে, তুমি শেখ আবু সৈয়দের বাটী তাঁহার হস্তের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন। তখনই আমি উঠিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, আমার আহ্বানে তোমার মনঃতুষ্টি হয় নাই, এখন খাজের আলায়হে চ্ছালাম পাঠাইতেই আসিয়াছ, এস! এই বলিয়া তিনি আমাব মুখে তুলিয়া আহার করাইয়াদিলেন। আমিও উদর পুরিয়া আহার করিলাম। পরে-তিনি একখানি পরিচ্ছদ লইয়া, নিজের হস্তে আমার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলেন।

হজরত বড়পীর সাহেব নদীর মধ্যে জল-জন্তুগণকে গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা দেন।

একটী আরবী রেসালা হইতে উর্দ্দূ অনুবাদ করিয়া মওলানা শাহ্ আহাম্মদ আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শেখ আহাম্মদ মগরবী বলিয়াছেন যে, একদিন কোতবে আলম গওসল আজম মহবুবে সোবহানি শিষ্য সমভিব্যাহারে কোথায় যাইতেছিলেন; সম্মুখে একটী নদী দেখিয়া নির্ভয় অন্তরে সবল মনে মুসা আলায়হেচ্ছালামের ন্যায় জলেব উপর দিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন।

সে সময় জল-জন্তু হাঙ্গর, কুম্ভির, শুশুক ও বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যগণ হজরত বড়পীরের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া কাতারে কাতারে ভাসিয়া উঠিল। এদিকে শিষ্যগণ গুরুদেবকে জলের উপর, নদী মধ্যে চলিতে যাইতে দেখিয়া, তাহারা অম্নি পশ্চাৎপদ হইল, জলের উপর গমন করিতে কাহারই সাহস হইল না। তখন তাহারা নিরূপায় হইয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। পরে নদীর মধ্যস্থলে সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, তিনি সমুদ্রের জলের উপরে অটল অচলভাবে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার চতুস্পার্শে জলজন্তুগণ বেষ্টন করিয়া ইলাল্লা ইলাল্লা শব্দ করিতেছে। আপনি জলজন্তুগণকে, গুপ্ততত্ত্ব মারফৎ বিদ্যা মহাতেজঃপুঞ্জ শরীরে শিক্ষা দিতেছেন। হজরতের মারফৎ বিদ্যা শিক্ষার গুণে সাগরের প্রত্যেক মৌজা (তরঙ্গ) হইতে যেন ইলাল্লা শব্দে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। শিষ্যগণ গুরুদেবের ঐ মোহিনী শক্তি দর্শন করিয়া, সে সময় তাহার সে মহামূর্ত্তি দর্শন করা অবিধেয় মনে করিয়া একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তরালে লুক্কাইত হইয়া রহিল। এদিকে বড়পীর সাহেব বীজমন্ত্রে (মারফৎ) জলজন্তুগণকে শিক্ষা দিতে দিতে উপসনার সময় দেখিয়া, চঞ্চলা ভাব ধারণ করিলেন, তখন সমস্ত বদনমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়াগেল। এমন সময় একজন

সবুজ রঙ্গের স্বর্গীয় দূত আসিয়া জলের উপর বিছানা বিছাইয়া দিলেন, হুজুর এমামতি আচার্য্যের কার্য্য সমাধা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন, দলে দলে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া পশ্চাৎভাগে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল। পরে হজরত বড়পীর সাহেব এমামতি করিবার পূর্ব্বে শিষ্যগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলিলেন, হে শিষ্যগণ তোমরা শীঘ্র শীঘ্র সাহসে নির্ভর করিয়া জলের উপর নিঃসন্দেহে চলিয়া আইস এবং স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে যোগদান করিয়া জামাতে নামাজ পড়িয়া লও। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ নিঃসন্দেহে সমুদ্র উপরে গমন করিয়া, জামাতে যোগদান করিলেন। হজরত বড়পীর সাহেব যখন এমাম হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আক্‌বার বলিলেন, ফেরস্তাগণ ও শব্দ করিয়া (আল্লাহ আক্‌বার) ঈশ্বর মহান বলিলেন, এমন সময় একজন জ্যোতির্ম্মান মহাপুরুষ আসিয়া দক্ষিণভাগে জামাতে যোগদান করিলেন(১)। যখন সেই মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন তাঁহার জ্যোতিতে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া গেল। সে সময় বড়পীর সাহেব আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনি এমন শব্দে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীতে শব্দটী পৌঁছিয়াছিল। পরে

(১) সেই জ্যোতির্ম্মান মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ (সঃ)

উপাসনা শেষ করিয়া, হস্ত উঠাইয়া এই দোয়া প্রার্থনা করিলেন। স্বর্গীয় দূতগণ পশ্চাৎ থাকিয়া হাত তুলিয়া, আমিন আমিন বলিতে লাগিলেন।

বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থনা।

আল্লাহোম্মা ইন্নি আস্‌লোকা বেহাক্কে
জাদ্দি মোহাম্মাদেন হাবিবেকা ওা খায়রোন
মেন খালকেকা ইন্নাহো লাতাক্‌বিজ রুহে মুরিদি
ওা মুরিদাতোল আওলিইয়াল্লা ইল্লা আলা তওবাতে।

অর্থ।

হে দাতা দয়াময় খোদাতায়ালা আমি তোমার নিকটে সত্যের সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি। মহাম্মদ সলল্লাহে আলায়হেচ্ছাল্লাম তোমার বন্ধুর সাহায্যে যে সমুদয় পৃথিবীর লোকের প্রাণ তোমার অধীনে আছে, আমার সমুদয় শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্যগণকে আর আমার বংশধরগণ ও তাঁহাদের শিষ্যগণকে ক্ষমা করিয়া দাও; আমিন অর্থাৎ কবুলকর। মনাজাত সম্পূর্ণ হইবার পরেই দৈববাণী হইল। তোমার প্রর্থনা গ্রহণ করিলাম, যখন তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

বড়পীর সাহেবের ধ্যানযোগে খোদা দর্শন।

শেখ আহাম্মদ ফারুকি সেরহেন্দী নকসাবন্দী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হজরত বড়পীর সাহেব ধ্যানযোগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর খোদাতায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তখন আদেশ হইল, হে প্রিয়বন্ধু আব্‌দোল কাদের। তুমি কি চাও? তখন তিনি বলিলেন, হে কৃপাময় করুণাসিন্ধু! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ দাসকে সকল বিষয়ই দান করিয়াছেন, হজরত মহাম্মদ (সঃ) মের যে নবুওত মাধুর্য্যগুণ, আলি করমুল্যা অজহুর বেলায়েত গুপ্তবিদ্যা, হাসিন সহিদে কাবর্বালার সাহাদতে কবরি মৃত্যুর সহিষ্ণু ধৈর্য্যগুণ, এবং আপনার ক্বাদরিয়েত মোহিঐশি শক্তি বহুদর্শিয় ক্ষমতা উহা সকলই আমাকে দান করিয়াছেন। তবে আর কি যাচ্‌ঞা করিব? তখন আদেশ হইল, আর তোমাকে তিনটী গুণ দান করিলাম। প্রথম সাধুত্ব, দ্বিতীয় দাতব্য, তৃতীয় আশক্ত। হজরত বড়পীর সাহেব এই সকল গুণে পূর্ণ ছিলেন বলিয়া সকল লোকের মন প্রাণ হজরত পীর সাহেবের দিকে পড়িয়া থাকিত, যেমন আমলাতাল কাজীয়ে নামক গ্রন্থে, শেখ আহম্মদ বোগদাদী লিখিয়াছেন।

সকলের অন্তঃকরণ বড়পীর সাহেবের দিকে।

শেখ ওমর বোজাজ বলিয়াছেন, এক সময় জোম্মার দিনে হজরত বড়পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া জামে মসৃজিদে জুম্মা পড়িতে পৌঁছিলেন। আমরা মসৃজিদে যাইয়া দেখিলাম যে, লোকে লোকালয় লক্ষ লক্ষ লোক জুম্মার উপসনা করিবার জন্য উপস্থিত। কিন্তু আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, কি আশ্চর্য্য একটী লোকও বড়পীর সাহেবের দিকে ফিরে তাকাইল না, সালাম করিবার যাহা প্রথা তাহাও করিল না, সম্মান সূচক করমর্দ্দন করিতে হয়, তাহাও করিল না। তখন আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য অন্য দিন বড়পীর সাহেবের লোকে কতই সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু আজ কেন, কেহই হজরত বড়পীরের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে নাই, ইহার কারণ কি? আমি যখন এইরূপ মনে মনে বলিতেছিলাম, তখন তিনি একবার মাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অন্য সকল লোকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তখন সমুদয় লোক পীর সাহেবকে সালামের উপর সালাম করিতে লাগিল এবং মোসাফা করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোকের ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, মস্ত একটা ভিড় পড়িয়া গেল; এমন কি মসৃজেদে আমাদের প্রবেশ করা দুষ্কর

হইয়া পড়িল। পরে নামাজ পড়িয়া, বক্তৃতা করিয়া সকল লোক দিগকে শুনাইয়া দিলেন। তৎপরে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ওমর! তোমার ইচ্ছাত পূর্ণ হইয়াছে। তাহাত তুমি জ্ঞান নাই যে, জগতের সমুদয় লোকের অন্তঃকরণ আল্লাহু তায়ালা আমার অধীনে রাখিয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা হয় ত আমি সকল জগৎবাসীর মনপ্রাণ আমার দিকে আকর্ষণ করি। নহে তাঁহাদের অন্তঃকরণ অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখি। আমি বড়পীর সাহেবের এ আশ্চর্য্য মহিমা অবগত হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক কোটী কোটী প্রণিপাত করিয়া ফিরিয়া আইলাম।

হজরত বড়পীর সাহেবের হাঁবলি মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

খাওারকাল আখিয়ার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু মহাম্মদ সৈয়দ আব্দোল জব্বার বলিয়াছেন, হজরত বড়পীর সাহেব হাঁবলি মজহাবে ছিলেন, কিন্তু একদিন মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, হাঁবলি মজহাব ত্যাগ করিয়া হান্ফি মজহাব গ্রহণ করিব। তিনি এইরূপ কেবল মনে মনে ধারণা করিলেন সত্য কিন্তু তখন ও পথ ত্যাগ করেন নাই। সন্ধ্যাকালে মোরাকেবায় ধ্যানযোগে দেখিতে-ছেন কি, হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) কে এমাম

আহাম্মদ হাঁবল সাহেব, তাঁহার হস্তের একগাছি রজ্জু ধরিয়া বলিতেছেন, হে ভবপারের কাণ্ডারি রসুলে করিম (সঃ) আপনার বংশধর রত্নকুল চূড়ামণি আব্‌দোল কাদের জিলানী। আমার মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি একটু বলিয়া কহিয়া, আমার মজহাব ত্যাগ করিতে উহাকে নিষেধ করুন। কেননা উহার দ্বারায় আমি পরকালে সকল এমামের নিকট গৌরব করিতে পারিব। এমাম সাহেবের বিনয় বচনে, হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) সন্তুষ্ট হইয়া, বড়পীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে বংশধর গুণমণি মহবুবে সোবহানি! একজন মহাদর্শি লোকের অমান্য করিয়া ইঁহার মজহাব ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়, তুমি এমাম আহাম্মদ সাহেবের হাঁবলি মজহাবে যেমন আছ অমনি থাকিয়া যাও। তখন হজরত বড়পীর সাহেব এমাম সাহেবকে বলিলেন, হে পূজ্যপদ পুরুষ! আমি যতদিন জগতে জীবিত থাকিব, কখনই আপনার মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব গ্রহণ করিব না এবং অন্তরের মধ্যেও স্থান দিব নাই ইন্‌শাল্লা। আপনার মজহাবেই আমাকে চিরকাল দেখিতে পাইবেন। বড়পীর সাহেবের এরূপ সংকল্প দেখিয়া, হজরত মহাম্মদ (সঃ) এমাম সাহেবকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন। এই

ঘটনার কিছুদিন পরেই হজরত বড়পীর সাহেব পবিত্র মক্কাধামে হজ্জব্রতে আগমন করিলেন। হজ্জব্রতে যাইয়া উপাসনা করিতে কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কাবার চারিদিকে চার মজহাবের চার জন এমামের মছাল্লা বিছানা আছে। অন্য অন্য সকল এমামের দিকে শত শত লোক দণ্ডায়মান, তবে আবু হানিফার এমামের দিকে কোটী কোটী লোক সমবেশ আছে, কিন্তু হাঁবলি এমামের দিকে দু দশজন মাত্র লোক বর্ত্তমান। বড়পীর সাহেব যখন হাঁবলি দলভুক্ত, কাজেই তিনি সেই দিকে এমামতি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন চারি মজহাবের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া বড়পীর সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িয়া লইলেন। কেবল সেই দিনেই হাঁবলির দিক লোকে পূর্ণ হইয়াছিল।

বড়পীর সাহেবের হাঁবলি এমামের জিয়ারত।

উক্ত খাওরাকাল আখিয়ার নামক গ্রন্থে, সৈয়দ আব্দোল জব্বার ও আবু মহাম্মদ রহমাতুল্যা আলায়হে দ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা সাহাজাদা আলির মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, একবার মহাত্মন পীর গুণধর মহবুবে সোবহানি হজরত এমাম আহাম্মদ

বেন হাঁবল সাহেবের জিয়ারত করিবার মানসে তাঁহার সমাধি স্থানে উপস্থিত হন। প্রথম তাঁহার সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছালামো আলায়কুম ইয়া এমামো" তখনই কবর বিদীর্ণ হইয়া এমাম আহাম্মদ হাঁবল সাহেব কবর হইতে বহির্গত হইয়া, সালামের জওয়ার দিবার পরে তাঁহাব হাত ধরিয়া মোসাফা করিলেন, তৎপরে একটী পরিচ্ছদ লইয়া স্বয়ং তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। পরিচ্ছদটী অঙ্গে পরাইয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, উজ্জলকর দিন মহাম্মদী এবং শিক্ষাদাও জগতের লোকে এলমে শরিয়ত, এলমে হকিকত, এলমে তরিকত ও এলমে মারফত। এই বলিয়া কবর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বড়পীর সাহেব জেয়ারত ভক্তি-দর্শন করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

বড়পীর সাহেব আবু হানিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তহ্ফাতল আসরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ বাকায়ে কদ্দুস সের্‌রহো হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত বড়পীর সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন, অকস্মাৎ মনে মনে এক সময় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন কোন অদৃশ্যভাবে শূন্যে ভ্রমণকারী মৃত মহাপুরুষের জেয়ারত করিতে পাই,

তাহা হইলে আমার মনবাসনা পূর্ণ হয়। ইহা বলিতে বলিতেই আমাকে নিদ্রায় অচেতন করিয়া ফেলিল। সে সময় আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, এমাম আহাম্মদ হাঁবল সাহেবের সমাধিস্থলে একজন জ্যোতির্ম্ময় মহা সাধু পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন আর একবার একবার তাহা হইতে শব্দ হইতেছে, দর্শন কর, দর্শন কর, ঐ আমি। যাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য, তুমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ ? এমন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর-দিনে এমাম হাঁবলির সমাধিস্থলে যাইয়া দেখিলাম যে, একজন জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ সমাধিপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। আমার পদ শব্দ পাইবামাত্র তিনি উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া উড়িয়া চলিলেন, একটী নদীর তীরে আসিয়া আর একজন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উড়িয়া গেলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে খোদাতায়ালার সপথ দিয়া কহিলাম, সত্য করিয়া বলুন আপনি কে ? তখন তিনি বলিলেন, "হানিফান মোসলেমান" অর্থাৎ মুসলমানের সত্য পথ প্রদর্শক, এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরে এক সময়ে হজরত মহাম্মদ (সঃ) কে অদৃশ্য পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, সমুদয় জগতের মধ্যে ঐ একজন আবু হানিফা মরদানে মৃত অদৃশ্য

পুরুষ। যাঁহার মজহাব সত্যপথ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে।

বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান।

সেফাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আব্‌দোল্যা আহাম্মদ বেন থাজের চিশ্‌তি মুছালি বলিয়াছেন, একদিন তিমিরাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার নিশিথ সময়, হজরত বড়পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া এমাম আহাম্মদ হাঁবল সাহেবের সমাধি জেয়ারত করিবার মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথে আসিয়া দেখি চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, পথে কোথা কি আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কোথায় যে পা পড়ে তাহারও ঠিক নাই, সে সময় রাত সাঁই সাঁই করিতেছে, একে চতুর্দ্দিকে পথের চারিধারে নানাপ্রকারের বৃক্ষ আছে, কোথায় পড়িয়া যাইব কি না, তাহারও ভাবনা। এ অবস্থায় অন্ধকারে পথ চলা কঠিন ভাবিয়া, বড়পীর সাহেবকে কহিলাম, হুজুর! আজকে জিয়ারত করিতে যাওয়া কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে। ভয়ানক অন্ধকার, কাছের বস্তু যে তাহাও দেখা যায় না, তাহাতে কেমন করিয়া যাওয়া যায়। তবে আলোক হস্তে থাকিলে, নিঃসন্দেহে চলিয়া যাইতাম।

আমার মুখের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, অমনি তিনি বৃক্ষদিগকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, হে বৃক্ষ সকল! তোমরা আলোক দান করিয়া, আমার পথ চলার কষ্ট নিবারণ কর। পীরবাক্যের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি, বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলা মাত্রেই প্রদীপের আলোর ন্যায় সকল বৃক্ষ হইতে শত শত আলোক বাহির হইল। আমরা ক্রমাগত যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অগ্রের বৃক্ষ হইতে আলোক পাইয়া সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলাম। পরে সমাধি জেয়ারত করিয়া, ফিরিয়া আসিবার সময় ঐরূপ পরস্পর বৃক্ষের আলোক পাইয়া বিনা কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

মদিনায় রসুলের সমাধি জেয়ারত।

নেকাতাল আসরার গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ মহাম্মদ ওসমান বোগদাদি রহমাতুল্যা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একবৎসর হজ্বের সময়ে, হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানি বড়পীর সাহেব হজ্বব্রত সম্পূর্ণ করিবার মানসে; পবিত্র মক্কাধামে গমন করেন। তিনি হজ্বব্রত পূর্ণ করিয়া মদিনা শরিফে আগমন করিলেন। হজরত মহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর সমাধিস্থলে প্রবেশ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে ভক্তি

ভাবে জেয়ারত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় তন্ময়চিত্তে ভক্তিভাবে এককালিন চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত জিয়ারত ভক্তি দর্শন করিলেন। তথাপি সেখান হইতে বাহির হইল না যখন, তখন আর হজরত মহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) স্থির থাকিতে না পারিয়া কবর হইতে বহির্গত হইয়া, বড়পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাহার হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, যাও বৎস আব্দোল কাদের! গৃহে ফিরিয়া যাও, দয়াময় খোদা-তায়ালা তোমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই বলিয়া, কবব মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বড়পীর সাহেবও সেখান হইতে বোগদাদ শরিফ ফিরিয়া আইলেন।

বড়পীর সাহেব নরকে পাপীর শাস্তি দর্শন করেন তাহার বিবরণ।

আম্মায়ে মশায়েখ কদ্দুসাল্লাসের হো হইতে বর্ণিত আছে, একদিন হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেব (মোরাকেবায়) ধ্যানযোগে নরকে পাপীগণের ভীষণ শাস্তি দেখিতে পাইলেন। যমদূতগণ যমদণ্ড লইয়া পাপীদের নরক মধ্যে কঠিন কঠিন শাস্তি করিতেছে। পাপীগণ লোহমুদ্গরের প্রহার খাইয়া, মলাম, মলাম বলিয়া, যাতনায় অস্থিব হইয়া ভবানক চীৎকার করিতেছে,

কেহ বা দয়াময়ের দয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া, যন্ত্রণা, শাস্তি, ভোগ করিয়া অগ্নিদাহনে দগ্ধভূত হইতেছে; কাহার অঙ্গে অগ্নি পরিচ্ছদ পরা, তাহা ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, কেহবা অগ্নি শয্যায় শয়ন করিয়া, জল জল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, কাহার বা যমদূতগণ জিহ্বা কর্ত্তন করিতেছে এবং কাহার বা শাঁড়াসি দিয়া চক্ষের তারা বাহির করিয়া লইতেছে; কেহ বা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া রক্ত, পুঁজ, মল, মূত্র, গরম জল, পান করিতেছে; কাহাকে বা বিছা, সর্প দংশন করিয়া বিষের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে; কাহারও উদর, জ্বালার মত উচ্চ হইয়াছে, তাহা হইতে শরিসৃপ, সাপ ও বিচ্ছু নির্গত হইয়া, তাহাকেই দংশন করিতেছে, কেহবা অগ্নিময় নরকানলে পড়িয়া ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে; কাহাকে বা হেট মুণ্ডে রাখিয়া যমদূতগণ লৌহদণ্ডে প্রহার করিয়া তাহাদের অস্থি, পাঞ্জর, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, সেই সকল পাপীদের চীৎকার শব্দে, পর্ব্বত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে।

দয়ার সাগর পীরগুণধর পাপীগণের নরক যন্ত্রণা দর্শন করিয়া, রোষ নয়নে যমরাজ নরকের কর্ত্তাকে ডকিয়া কহিলেন, হে নরকের মালেক! আমার কোন শিষ্য কি শিষ্যের শিষ্য, তোমার কাছে পড়িয়, নরক যন্ত্রণা ভোগ

করিতেছে। বড়পীরের কর্কশ বচনে, আরক্ত লোচনে, তীব্র দৃষ্টিতে নরকের কর্ত্তা হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হুজুর! আপনার কোন শিষ্য আমার অধীনে নাই, এবং আমি এমন কোন ক্ষমতা রাখিনা যে, আপনার শিষ্যের কঠিন শাস্তি প্রদান করি। তখন তিনি মালেককে কহিলেন, সপথ সেই জগত কর্ত্তা বিশ্বপালকের, যাঁহার আদেশে পাপীর দণ্ড, পুণ্যবানের স্বর্গসুখ ভোগ। তাঁহারই নাম লইয়া সপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমার কোন শিষ্য পর্ব্বত পরিমাণ পাপ করিয়া, নরকে পড়িয়া থাকিত, নিশ্চয় তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া, স্বর্গে লইয়া যাইতাম। যে দয়াময় খোদাতায়ালা আমাকে পাপী-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সনন্দ দস্তখত লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। পরকালে কেয়ামতের দিবস আমার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য এবং আমার ভক্তদিগকে যতক্ষণ না সঙ্গে লইয়া, স্বর্গে গমন করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গের দ্বারে পা রাখিব না। হে পাঠকগণ! দেখুন, হজরত বড়পীর সাহেবের কতদূর ক্ষমতা ছিল।* পরকালেত তাঁহার শিষ্যের প্রতি নরকাগ্নি স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং পৃথিবীতেও তাঁহার ভক্তের প্রতি শ্মশান অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে নাই।

একপীর ভক্ত হিন্দু শ্মশান ভূমিতে অগ্নিতে দাহন হয়না তাহার বিবরণ।

মনজর আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ছামছামল কেরামত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বোরহান পুরগ্রামের হিন্দু পল্লিতে একজন ধনাঢ্য হিন্দু বাস করিতেন। তিনি কোন সময় কাহার মুখে বড়পীরের প্রশংসা শুনিয়া, দিনে দিনে বড়পীর সাহেবের প্রতি তাহার এত বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মাইতে লাগিল যে, কেহ তাহার নিকট বড়পীর সাহেবের নাম করিলে, তাহাকে ধন, রত্ন, টাকা কড়ি দিয়া সন্তোষ করিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। কেহ বড়পীরের নাম করিয়া কিছু তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে, তিনি তখনই তাহাকে অর্থ দিয়া, তাহার মনোআশা পূর্ণ করিয়া দিতেন। কেহ বড়পীর সাহেবকে আনিয়া সভা সমিতির ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে সভা খরচের জন্য কিছু কিছু দান করিতেন। ক্রমে এসলাম ধর্ম্মের প্রতি এমন বিশ্বাসী হইয়া উঠিল যে, মুসলমান না হইয়া আর থাকিতে পারিল না। অনেক পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন থাকার কারণে, প্রকাশ্যে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, গোপনে একজন বড়পীর সাহেবের শিষ্যের নিকটে মুসলমান হইয়া, দেব দেবীর

প্রতিমা মূর্ত্তি পূজা সকলই ত্যাগ করিলেন। কেবল মাত্র প্রকাশ্যে মুসলমানদের সহিত আহার ব্যবহার উঁঠাবসা, সমাজ ভয়ে করিতে পারিলেন না। কিন্তু দীন দুঃখি মুসলমান দিগকে সমাদবের সহিত আহার করাইয়া ও তাঁহাদিগকে দান খয়রাত করিতেন। যখন সেই পীর-ভক্ত ছদ্মবেশী মুসলমান পরলোক গমন করিলেন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু মিলিয়া মৃত শবদেহ দাহ করিবার জন্য হিন্দু প্রথানুযায়ী শ্মশান ভূমে লইয়া গেল। মহা-সমারোহে ধুম ধামের সহিত নিম ও চন্দন কাষ্ঠে চিতা সাজানো হইল। তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত হুতাশনে সমুদয় চিতা সজ্জিত কাষ্ঠ পুড়িয়া, ছাই ভস্ম হইয়া গেল কিন্তু সবদেহের একটু পশম পর্য্যন্ত দগ্ধ হইল না, তাহা দেখিয়া, ভাই বন্ধু সকল হিন্দুগণই আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; যে লোক বড়পীরের প্রধান ভক্ত প্রকৃত মুসলমান, অগ্নিতে তাহার কি করিবে? ভালবাসার ভালবাসাকে করুণাময় খোদাতায়ালা কেমন করিয়া তাহাকে অগ্নিতে দাহন করিবেন। যে হেতু পৃথিবীর অগ্নি নরকাগ্নি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া ভালবাসার ভালবাসাকে সেই অগ্নিতে পোড়াইবেন। যখন মহাপাপী নমরুদ হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের

অঙ্গে একখানি নিজের পরিচ্ছদ পরাইয়া, তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথন তাঁহার নগরুদরুত পরিচ্ছদটী অঙ্গ হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইল। কিন্তু দয়াময় দয়া করিয়া আপন বন্ধুকে অনল হইতে বাঁচাইয়া লইলেন, বরং বন্ধুর জন্য জ্বলন্ত অনল পুষ্পোদ্যান করিয়া দিলেন। ধন্য দয়াময়ের বিচিত্র লীলা, ধন্য তাঁহার ভক্তের প্রতি দয়া। এদিকে হিন্দুগণ শবদেহ পুড়াইতে না পারিয়া পুনরায় কাষ্ঠ আনিয়া চিতা সাজাইয়া জ্বালাইয়া দিল। কিন্তু সে বারেও পুড়িল না, তথন নিরুপায় হইয়া মৃতশব নদীগর্ভে ভাসাইয়া দিল। হিন্দুগণ শবদাহ করিতে অপারক হইয়া, নদীগর্ভে যথন ভাসাইয়া দিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল, তথন আদর্শ পীরগুণধর জানিতে পারিলেন।

খোদাতায়ালার কি অপার মহিমা, তিনি জগতে যাঁহাকে পীর আওলিয়া করিয়া পাঠান, তাঁহাকে নানাগুণে অভিষিক্ত করিয়া দেন। তাঁহার মন প্রাণ অন্তঃকরণ আদর্শ দর্পণের ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া পড়ে। যিনি ভক্তবৎসল, তিনি কথন প্রিয় ভক্তকে ভুলিয়া একদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। যথন মৃত শব নদীর স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যায়, তথন হজরত বড়পীর সাহেব একজন দরবেসকে ডাকিয়া বলিলেন, হে দরবেস!

আজ আমার একটী প্রধান ভক্তের সদগতি হয় না, নদী-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত তোমাকে অবগত করাইতেছি। বরহান পুরের যে ধনাঢ্য-শালী দাতা হিন্দু লোকটী মারা পড়িয়াছে, তিনি আমার পরম ভক্ত, তিনি গোপনে আমার একজন শিষ্যের কাছে মুসলমান হইয়াছিল, উহার এস্‌লামী নাম সাদাল্লা, হিন্দুগণ তাঁহাকে তাহাদের প্রথানুযায়ী শ্মশানে পুড়াইতে যায়, কোন প্রকারে তাঁহাকে জ্বালাইতে না পারিয়া, শেষে নিরুপায় হইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে। তুমি এখন লোকজন সঙ্গে লইয়া, নদী হইতে তীরে তুলিয়া তাঁহার জানাজা পড়িয়া কবর দিয়া আসিবে। দরবেস পীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে, তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন, শবদেহ নদী হইতে তুলিয়া সায়দাল্লাকে কবর দিয়া সকলেই ফিরিয়া আইল। পরে সেই দরবেসটী বড় পীরের কাছে নিবেদন করিলেন, হুজুর! সায়দাল্লা এমন কি পুণ্যাহ্‌ করিয়াছিল যে, তজ্জন্য জ্বলন্ত অনলে উহার কিছুই পুড়িল না। তখন তিনি কহিলেন, হে দরবেস! তুমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় জান না, আচ্ছা, এখন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি। যিনি নিরাকার নিরঞ্জন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর! যাঁহার কৃপাগুণে পরকালে মহামহা পাপী মুক্তিলাভ করিয়া অক্ষয়

স্বর্গ লাভ করিবেন, সেই দাতা দয়াময় দয়া করিয়া আমার সহিত সত্য করিয়াছেন যে, তোমার শিষ্য বা ভক্তগণ বিশ্বাসী হইয়া যদি মৃত্যু হয় ইহকালে ও পরকালে কোন প্রকারেই তাঁহাকে অগ্নিতে দাহন করিতে পারিবে না। তবে কেমন কবিয়া, হিন্দুগণ সায়দাল্লাকে অগ্নি দিয়া জ্বালাইতে পারিবে। হে পাঠকগং! বুঝিয়া দেখ, যাঁহার ভক্তকে এই ধরাতলে অগ্নিতে পুড়াইতে পারিল না, তবে কেমন করিয়া নরকাগ্নি পরকালে তাঁহার শিষ্য বা ভক্ত দিগকে জ্বলন্ত অনর্ল স্পার্শ করিবে। আরও ভাবিয়া দেখ, যখন একজন ছদ্মবেশী মুসলমানকে অগ্নিতে জ্বালাইতে অপারক, তখন প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান বড় পীর সাহেবের সঠিক ভক্তকে, নরকাগ্নি তাঁহার কি করিবে। হে পাঠক পাঠিকাগণ! এখন সেই বড়পীর সাহেবের জীবনী ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া নরকানল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা কর।

ত্রিপদ।

কি ভয় তাঁহার, জগতে যাঁহার, সখা হয় বড়পীর।
নরক অনল, নিভিবে সকল, যদি মন থাকে স্থির॥

মহর্ষি নেজামদ্দিন জরিজরবখ্‌সের সোলতা-নাল মসায়েখ নাম প্রাপ্ত।

আসরার সালেকিন ও মজলেস রোবাই আশার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ ফরিউদ্দিন গঞ্জেসকর রহমাতুল্যা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে; হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেব, এক সময় হজব্রতে গমন করিয়া, মদিনা শরিফে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এদেকে হজরত নেজামদ্দিন ঋষি প্রবর কাবা শরিফে জুম্মা পড়িবার জন্য প্রতি শুক্রবারে দিল্লি হইতে পবিত্র মক্কায় আসিতেন। যখন হজরত নেজামদ্দিন (রঃ) স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মক্কায় জুম্মা পড়িতে আইলেন, আদর্শ পীরগুণধর তাহা জানিতে পারিয়া একটী পত্র লিখিয়া ভৃত্যের হস্তে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তিনিও মদিনা আসিতে-ছিলেন, পথিমধ্যে বড়পীরের পত্র পাইয়া, সন্তোষ হৃদয়ে এক সঙ্গেই দুইজন মিলিযা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। হজরত নেজামদ্দিন পীর চরণে চুম্বনদান করিয়া কহিলেন, হুজুর! আমি এখানে আসিয়াছি আপনি তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন এবং কি জন্যই বা এ দাসকে আহ্বান করিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, নেজামদ্দিন! তোমাকে সোলতান উপাধি

দান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি। আজ হইতে তোমার নাম নেজামদ্দিন সোলতানল মশাএখ হইল। এস, আমার কাছে সরিয়া আইস। তোমার অঙ্গে পীর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিই। এই বলিয়া পরিচ্ছদ খানি তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। হজরত নেজামদ্দিন মনের মতন বস্তুদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, মহানন্দে দিল্লি ফিরিয়া আইলেন। এই সাধুপুরুষের অতিথ শালায় লোকের অন্ন ব্যঞ্জনের জন্য প্রত্যহ সতের-মন লবন ব্যয় হইত এবং প্রত্যহ একটী উষ্ট্রে সপ্তদশবার পিয়াজ রশুনের খোশা বহিয়া ফেলিত। এই সাধু প্রবরের সমাধি স্থান পুরাতন দিল্লি, যদি কেহ ইঁহার সমুদয় বৃত্যান্ত অবগত হইতে চান, ইঁহার জীবনী পাঠ করিলেই জ্ঞাত হইবেন। *

বড়পীর সাহেবের মাধুর্য্য ভাষায় এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার ও চারিজন সহচর সহ শেষ নবী হজরত মহাম্মদের সেই সভায় আগমন।

একদিন বড়পীর সাহেব হর্ষ উৎফুল্ল চিত্তে প্রশান্তমনে মাধুর্য্য ভাষায় মিম্বরে বসিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে

লাগিলেন। প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমেই বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, হে মোসলেমগণ! তোমরা অদ্বিতীয় নিরাকার নিরঞ্জনের প্রতি ও তাঁহার শেষ নবি প্রেরিত পুরুষ প্রভু মহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যে খোদাতায়ালার কৃপায় মানব দেহ ও বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারি প্রেমে মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া কায়মন বাক্যে তাঁহারই উপাসনা, অর্চ্চনা, স্তব—স্তুতি ও তপস্যা করিতে করিতে এ জীবন অতিবাহিত করিয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সেই সত্য ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা প্রভু মহাম্মদ (সঃ) যাঁহার অনুগ্রহে সত্য সনাতন এসলাম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব শক্তিমান খোদাতায়ালাকে চিনিতে পারিয়াছ, যিনি পাপের অন্ধকার ময় কলুষকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া, তোমাদিগকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইবেন, যিনি ভবার্ণবের কাণ্ডারি, যাঁহার ধর্ম্মে ইহকালে শান্তি, পরকালে মুক্তি, তাঁহার উপরে তোমরা শুদ্ধ মনে সরল অন্তরে দরুদ পাঠকর। শেখ বেকার রহমাতুল্যা আলায়হে বলিয়াছেন, আমিও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলাম, অকস্মাৎ হজরত বড়পীর সাহেব ওয়াজ করিতে করিতে নিঃশব্দ হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি মিম্বর হইতে নিম্নে নাবিয়া, সেই মিম্বরোপরে ফরশ বিছাইয়া দিলেন; সে সময়

দেখিতে পাইলাম যে, হজরত মহাম্মদ (সঃ) জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রধান চারিজন সহচর সঙ্গে সভায় উপস্থিত হইয়া মিম্বর উপরে বসিলেন। পরে হজরত বড়পীর সাহেব নিম্নে দাঁড়াইয়া এমন তেজঃপুঞ্জ শরীরে উপদেশ দান করিলেন যে, নিজেই জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন হজরত মহাম্মদ (সঃ) তাঁহাকে উঠাইয়া সহচর সহ সভা হইতে অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রোতাগণ সেই সময় নিবেদন করিল, হুজুর! ওয়াজ করিতে করিতে মিম্বর হইতে নাবিয়া পড়িলেন কেন, কেনই বা পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন? তখন তিনি সমুদয় ঘটনা আমাকে বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। আমিও পীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, বলিতে আরম্ভ করিলাম, যেরূপে হজরত মহাম্মদ (সঃ) আবুবকার, ওমর, ওসমান, আলি করমুল্যা অজহু সহ সভায় আসিয়াছিলেন এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা একে একে সমুদয় শুনাইয়া দিলাম। সেইদিন শ্রোতাগণে পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া, যে যাহার গৃহমধ্যে চলিয়া গেল।

সাধুদিগের পীর পদ স্কন্ধে ধারণ।

একদিন হজরত বড়পীরের সভায় প্রায় সপ্ত সহস্র শ্রোতাগণ উপস্থিত ছিল। তিনিও উপদেশ দিবার

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, মিম্বর উপরে আরোহণ করত, সুমিষ্ট বা মাধুর্য্য ভাষায় জলদ গম্ভীর স্বরে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, হে শ্রোতাগণ। তোমাদিগের সৃজন কর্ত্তা বিশ্বপালক জগদীশ্বর বলিতেছেন, তোমরা কখনই জীবিকার জন্য চিন্তা করিও না, যে হেতু আমার ভাণ্ডারে ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ আছে, প্রলয়কাল পর্য্যন্তও পূর্ণ থাকিবে, ইহা হইতে ধন রত্ন দান করিয়া ভিখারীকে ধনবান করি, রাজ ভাণ্ডার পূর্ণ করি, এইরূপ প্রকারে সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া আসিতেছি এবং আরও বিতরণ করিব, তথাপি আমার ভাণ্ডার কখন শূন্য হইবে না। দ্বিতীয় তোমরা অত্যাচারী প্রবল-প্রতাপ পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, নবাব জমিদার-দিগকে ভয় করিও না যে হেতু আমি সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব সময় বর্ত্তমান এবং সকলেরই আগমন আমার দিকে, আমিই সকলের বিচারক বা শাসন কর্ত্তা শাস্তি দাতা। তৃতীয় তোমরা কাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিও না ও কাহার নিকট প্রার্থিত হইও না, যেহেতু আমি তোমাদের পরম বন্ধু, দাতা দয়াময় নাম ধরি, সকল জীবগণকে পালন করিয়া থাকি এবং সর্ব্বাপেক্ষা দান করিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করি। চতুর্থ সকল বস্তু তোমাদের উপ-কারের জন্য সৃজন করিয়াছি, কেবল তোমাদিগকে আমার

উপাসনা, অর্চ্চনা, আরাধনা করিবার জন্য সৃষ্টি করিলাম। পঞ্চম, আমি তোমাদিগকে কল্যের খা আগতদিনের তরে, আমার অর্চ্চনা উপাসনা করিতে আদেশ করিনাই এবং তোমারাও আমার নিকট আগে জীবনের কল্যের জন্য, জীবিকা চাহিও না। ষষ্ঠ, চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, বন, জঙ্গল, নদ, নদী, সাগর, সলিল, পর্ব্বত, পাহাড়, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, পশু, পক্ষি ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে আমি কষ্ট বোধ করিনা, সুতরাং তোমা-দিগকেও জীবিকা দান করিতে তিলার্দ্ধও কষ্ট বোধ করিনা। সপ্তম, আমি তোমাদের জীবিকা দিবার কথা একদণ্ডও ভুলিনা, তোমরাও আমার নাম লইতে কখনও বিস্মরণ হইও না। অষ্টম, আমি যাহা তোমাদের অদৃষ্টে ধার্য্য করিয়া দিয়াছি, তাহাতে তোমরা সন্তুষ্ট থাকিও। কিন্তু কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বেশী আকাঙ্ক্ষা করিও না। নবম, আমি জগত পালক খোদাতায়ালা যখন তোমাদের পরম বন্ধু, তখন তোমরাও আমার প্রকৃত বন্ধু হইবার চেষ্টা কর। দশম, তোমরা সকলেই আমার শাস্তি হইতে নির্ভয় হইয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিও না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুমূর্ষু কালের, কবরের, উত্থাপন দিনের ও বিচার দিবসের শাস্তি হইতে রক্ষা না পাও এবং পরীক্ষার সেতু পার হইয়া স্বর্গগামী না হও। এইরূপে বড়পীর

দশটী উপদেশ দান করিয়া পুনরায় বলিলেন, "লাও লাকালেমা খালাকতোল আফলাকে" যে সময় হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) মেয়ারাজ শরিফ পৌঁছিলেন, এবং আরশে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলেন, সে সময় আমি পরমাত্মা রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমার স্কন্ধে পদদিয়া আরশের পবিত্র সিংহাসনে উপবেশন করুন, তখন তিনি আমাব স্কন্ধে পা রাখিয়া আরশের উপর আরোহণ করিলেন। পরে তিনি খোদা-তায়ালাকে বলিলেন, হে জগৎ পতি! এ কোন মহাত্মা, আমার চরণ দুখানি স্বযত্নে স্কন্ধে ধরিয়া আরশে আরোহণ করাইলেন? তখন দয়াময় আপন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, এ তোমারই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমারই প্রচারিত এসলাম ধর্ম্মকে নববলে বলিয়ান করিবেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মহিউদ্দিন! আমার চরণ যেমন তোমার স্কন্ধে স্থান পাইল, তেমনি তোমার ঐ পবিত্র চরণ জগতের সাধুগণের স্কন্ধে স্থান পাইবে। হে শ্রোতাগণ! সেই জন্য আজ আমি এই সভামধ্যে আমাব পবিত্র চরণের গৌরব করিতেছি। এই বলিয়া বড়পীর সাহেব, এই আরবী বচনটী পাঠ করিলেন।

আরবী শব্দ।

"কাদামি হাজেহী আলা রাকাবাতে
কোল্লে ওলিইয়ে আল্লাহে।

অর্থাৎ আমার চরণ সমুদয় সাধুপুষের স্কন্ধে; সেই সভাতে পঞ্চাশ জন সাধু ছিল, তখন তাঁহারা সকলেই আপন আপন স্কন্ধ মিম্বরের নিম্নে ঝুকাইয়া দিয়া, একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন;—

"আমান্না ওা ছাদ্দাকনা" সত্য সত্যই আপনার পবিত্র চরণ জগতের সমুদয় সাধুপুরুষগণের স্কন্ধে স্থান পাইবে। তখন হজরত বড়পীর সাহেব সকল তপসগণের স্কন্ধেই চরণ ধারণ করিয়াছিলেন। এমন কি সে সময় জগতের সাধু যে যেথানে ছিলেন সে সেইখানেই স্কন্ধ পাতিয়া দিয়াছিলেন, বড়পীর সাহেবও মোহিঐশী শক্তিবলে সকলের স্কন্ধে পা রাখিয়া সকল সাধুগণকেই ধন্য করিলেন। লাতায়েফ গারায়েব গ্রন্থে লিখিত আছে, সে সময় চতুর্ব্বিংশতি বয়স্ক চিশ্‌তি তরিকার প্রধান পীর খাজা মইনদ্দিন চিশ্‌তি সাধুপ্রবর, এরাক পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনিও আপন স্কন্ধ পাতিয়া দিলেন। কিন্তু সেই সভাস্থিত এসৃফাহান নিবাসী মদগর্ব্বিত এক সাধুপুরুষ, অহঙ্কার করিয়া মনে মনে বলিলেন, উনিও

একজন সাধু, আমিও একজন সাধুপুরুষ, তবে কি জন্য হীনতা স্বীকার করিয়া উহার পা আমার স্কন্ধে ধারণ করিব। এই বলিয়া গর্ব্বিত সাধু কু-প্রবৃত্তির কুহকে পড়িয়া, আপন ঘাড় না বাড়াইয়া অহঙ্কার বশত, বসিয়া রহিল। আদর্শ পীর গুণধর তাহা জানিতে পারিলেন, অহঙ্কারি তপস্বীর সেই সভায় তদণ্ডেই তাহার গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিদ্যা, পীরি ও ফকিরী বিনাশ পাইল। অতএব খোদাতায়ালা যাঁহার সম্মান বাড়াইয়া দেয়, তাঁহার অসম্মান করিয়া কে কোথায় রক্ষা পাইয়া থাকে। যেমন পারস্য ভাষায় একটী কবিতা লেখা আছে।

বয়েত।

নাম নেকা রফৎগাঁ যায়ে মাকুন।
তব্‌বেবা মানাদ নাম নেক্‌তো পায়েদার॥

অর্থ।

সুজনের নাম লোপ না কর কখন।
তবে নাম তব জগতে রহিবে সুজন॥

বিনা ওজুতে বড়পীর সাহেবের নাম লইলে জিহ্বা কাটা যায়।

শায়ে নছুছ নামক গন্থে লিখিত আছে দাউদ কিছরি

(রঃ) বলিয়াছেন, যিনি ওজুর সঙ্গে পবিত্র হইয়া হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জিলানী বলিয়া বড়পীর সাহেবের নাম লইতেন তিনি সমস্ত দিবস সুখে থাকিতেন। আর যিনি বিনা ওজু অপবিত্র হইয়া ঐ নাম লইত তাহার জিহ্বা কর্ত্তন হইয়া পড়িয়া যাইত। আর মনাকবে গোওশিয়ে নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত মহবুবে সোবহানির নামাঙ্কিত "দোওা সায়ফাল্লা" তাঁহার বংশধর প্রায়ই সন্ধ্যা সকাল পড়িয়া আসিতে ছিলেন। ক্রমাগত অনেক লোক তাহা শিক্ষা করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াদিলেন, কিন্তু অনেক লোক কয়েক শতাব্দী পরে আলস্য করিয়া বিনা ওজুতে জনুবাস্থায় অপবিত্র অশুদ্ধ হৃদয়ে সেই দোওাটী যাঁহারা পড়িত, তাঁহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইরূপ শত শত লোকের যখন জিহ্বা ও মস্তক কাটিয়া মারা পড়িতে লাগিল, তখন হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) বড়পীর সাহেবকে আসিয়া বলিলেন, হে আব্দোল কাদের! তোমার একি অন্যায় জ্বালালী ফায়েজ অর্থাৎ জলন্ত ক্রোধময় শক্তি। কত শত লোকে তোমার দোওা ও নাম লইতে গিয়া জিহ্বা ও মস্তক কাটা যাইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া বসিতেছে। দেখ! যিনি জগৎপালক সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার নাম বিনা ওজুতে

অপবিত্র থাকাতে শত সহস্রবার লইলেও কাহারও মস্তক কাটা যায় না। তুমি এখন এ সংকল্প ত্যাগ করিয়া ভক্তদের প্রতি শান্তিময় ভাব দেখাও। হজরত পয়গম্বরের কথায় লজ্জিত হইয়া, নিজের ভ্রম বুঝিয়া সে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, হে ভবপারের কাণ্ডারি দয়ার সাগর রহমাতুল্লেল আলামিন! আমি আপনার কথায়, আমার তেজময় মহাশক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলাম, আর কাহার কখন মস্তক বা জিহ্বা কাটা যাইবেক না; তবে যাহারা বিনা ওজুতে অপবিত্র ভাবে আমার নাম লইবে, তাহাদের পৃথিবীতে কখনই উন্নতি হইবে না, তাহাদিগকে নানা কষ্টে দিনপাত করিতে হইবে।

হজরত বড়পীর সাহেবের গুণের ব্যাখা।

মালাফুজ কোত্তোবল আবরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সাহেবদ্দিন (রঃ) বলিয়াছেন, রছুলের বাদে অন্য অন্য সহচর হইতে, তিনজন সাধুপুরুষের মান্য বেশী হইতেছে, প্রথম সাধু ওায়েস করনি দ্বিতীয় সাধু শেখ জনিদ বোগদাদি, তৃতীয় সাধু হজরত বহ্লুলদানা। আর এই তিন সাধু হইতেও উচ্চ পদ বা সম্মানীত হজরত বড়পীর সাহেব, কেননা ইনি সকল সাধুর সম্রাট। জগতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বগুণময় সাধু কেহই

জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং করিবেনও না। যাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাগুণে সমুদয় জগৎবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। যাঁহার বুদ্ধির তেজ অতি প্রবল। কেননা শেষ প্রেরিত পুরুষ বড়পীর সাহেবের দ্বারায় সর্ব্বদা গৌরব করিয়া বলিতেন, বনিএস্রাইল বংশের অন্য অন্য প্রেরিত পুরুষ হইতে, আমার উম্মত মণ্ডলীর গৌরব অপেক্ষা অধিক বেশি। এই কথা সিদ্ধান্তের জন্য শেষ প্রেরিত পুরুষ মেয়ারাজ গমন করিলেন, সকল প্রেরিত পুরুষগণ একত্রে হইয়া হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) কে বলিলেন, আপনি যে আপনার মণ্ডলীগণের সর্ব্বদাই গৌরব করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আজ আমরা দেখিতে চাই। তখন হজরত শেষ প্রেরিত নবি অন্য উপায় না দেখিয়া বড়পীর সাহেবের পরমাত্মাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আত্মারূপী বড়পীর সাহেব প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটে যাইয়া সালাম করাতে, হজরত মুসা কলিম, তাঁহার সালামের জওয়াব দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উম্মতে মহাম্মদি! তোমার নাম কি? তখন তিনি বলিলেন, আমার নাম আব্দোল কাদের, পিতার নাম সৈয়দ আবু স্যালেহ্, পিতামহের নাম সৈয়দ মহাম্মদ, তাঁহার পিতার নাম, সৈয়দ আবু আবদোল্লাহ্ এইরূপ প্রকারে সমস্ত পিতৃপুরুষগণের নাম বলিতে বলিতে আলি

করমুল্যা অজহু ও হজরত ফাতেমা খাতুনের নাম পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। তখন মুসা আলায়হেচ্ছাল্লাম বলিলেন, তোমাকে, তোমার নাম মাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তোমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিবার কি আবশ্যক ছিল। আত্মারূপী বড়পীর সাহেব বলিলেন, মহাত্মন! আপনি যখন কহতুর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তখন আপনাকে করুণাময় অন্তর্য্যামী বিশ্বপালক, কেবল মাত্র বলিয়াছিলেন মুসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? তখন আপনি বলিয়াছিলেন এটা আমার হস্তের একটা যষ্টি; ইহার দ্বারায় পশু চরাই, ইহাতে ঠেক দিয়া, ভর করিয়া থাকি, ছাগলের জন্য বৃক্ষের পত্র খাওয়াই এবং ইহার দ্বারায় আমার আরও অন্য অন্য কার্য্য হইয়া থাকে। তবে, কেন আপনি অন্তর্য্যামী খোদাতায়ালাকে এতগুলি পরিচয় দিয়াছিলেন, (১) তিনি ত অন্তর্য্যামী আপনার মনের ভাব অন্তরের ভাব সকলই জ্ঞাত আছেন। আপনি যে যষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আপনার সেই যষ্টির যে গুণ তাহা ত খোদাতায়ালাই দিয়াছিলেন। তবে কি আপনার সে কথা বলা ভ্রম নয়? আমি আপনার পূর্ব্বের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য আমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছি, কেননা

(১) সুরা তোহা।

যেহেতু আপনি একজন মানব মাত্র। একথা শুনিয়া মুসা নবি বলিলেন, হে শেষ প্রেরিত নবি! সত্য সত্যই আপনার উম্মতের গৌরব অধিক। হজরত বড়পীর সাহেব প্রেরিত পুরুষগণের তুল্য কি জন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শেখ কামালদ্দিন বর্ণনা করিয়াছেন।

লাতায়েফ লতিফ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ কামালদ্দিন (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে; যখন মানব, দানব, দেব, দৈত্য প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু সৃষ্টি হয় না, এ পৃথিবী জনশূন্য নীরব নিঃশব্দ কাহারও কোথায় চিহ্ন মাত্রই নাই। কেবল অনাদি অনন্তময় বিশ্বপালক সৃষ্টি কর্ত্তা নিজ মহিমা প্রচার করিবার জন্য, মানবগণের আত্মা সকল সৃষ্টি করিয়া, তিন সারি করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন। প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের পরমাত্মা, দ্বিতীয় কাতারে সাধুপুরুষগণের পরমাত্মা, তৃতীয় কাতারে সমুদয় মানবের আত্মা। এইরূপে আত্মা সকলকে যখন দাঁড় করিয়াছিলেন। সে সময় স্বর্গীয় দূতে বড়পীর সাহেবকে মধ্যম কাতারে সাধুগণের সঙ্গে দাঁড় করাইয়াছিলেন। কিন্তু বড়পীর সাহেবের আত্মা মধ্যম কাতারে না দাঁড়াইয়া, প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের সঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া, সাধুদের সঙ্গে মধ্যম কাতারে দাঁড়

করাইয়া দিলেন। পুনর্ব্বার তিনি প্রথম কাতারে গিয়া পয়গম্বরগণের সহিত যোগ দিলেন। আবার ফেরাইল। এইরূপ বারবার পাঁচ ছয় বার পাল্‌টা পাল্‌টী করাতে, স্বর্গীয় দূত বিরক্ত হইয়া দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানাইলেন। তখন করুণাময় জগদীশ্বর হজরত মহাম্মদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মহাম্মদ (সঃ)। তুমি তোমার বংশধর আবৃদোল কাদেরকে মধ্যম কাতারে স্থির হইতে বল। তবে উনি প্রলয়কালের শেষ বিচারের দিনে, প্রথম কাতারে তোমাদের সঙ্গে থাকিতে স্থান পাইবে। হজরত মহাম্মদ (সঃ) বলিলেন, হে আমার বংশের ধ্রুব নক্ষত্র পূর্ণময় জ্যোতিঃ! পয়গম্বরী যখন আমা হইতেই শেষ, আমার পশ্চাতে আর কেহই প্রেরিত পুরুষ হইবে না, তখন তুমি কেমন করিয়া প্রথম কাতারে, আমাদের সঙ্গে স্থান পাইবে। এখন যাও, খোদাতায়ালার আদেশ মান্য করিয়া মধ্যম কাতারে সাধুদিগের সহিত দাঁড়াও। তবে আমি সত্য করিতেছি প্রলয়কালের শেষে বিচার দিবসে সকলের প্রথম কাতারে আমার দক্ষিণ ভাগের পহ্‌লুর নিম্নে মকাম মহ্মুদ নামক উত্তম স্থানে তুমি থাকিতে পাইবে। হজরত বড়পীর সাহেব সৃজনকালে পয়গম্বরগণের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জগতে তিনি সর্ব্বগুণে গুণময় হইয়াছিলেন।

বড়পীরের নিকট পৃথিবীর চাতুরি করিবার বিবরণ।

এল্‌তাবাসাল আনওয়ার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু আব্‌দোল্যা মহাম্মদ আপন পিতার মুখে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; হজরত পীর দস্তগীর মহবুবে সোবহানি আব্‌দোল কাদের জিলানী দয়া, দান, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদালাপ, মিষ্টভাষা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সকলপ্রকার সদ্‌গুণে বিভুষিত ছিলেন। তাঁহার আদর্শভাব, কেরামত দর্শনে লোকে বিমোহিত হইত। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণ পীরি ফকিরী গুণে, লোকের মন কাড়িয়া লইতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, তাঁহার প্রতিশোধ লইতে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন না, বরং ক্ষমতাগুণের দ্বারা নিজের মহত্ব ও ক্ষমাশীলতার অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। অতি ভয়ানক মহা পরাক্রমশালী শত্রুকে দাঁয়ে পাইলেও, তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। নিরাশ্রয় ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া স্মরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। ভক্ত ও শিষ্যগণে তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রেই সম্পুর্ণ করিয়া দিতেন। তিনি কোন কার্য্যে কাহারও সাহায্য লইতেন না এবং কাহার

নিকট কোন বস্তু যাচ্‌ঞা করিতেন না। কখন তিনি ধনাঢ্য কি আমির কি বাদসা কি উজির দিগের সম্মানের জন্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেন না, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি সমাদর করিতেন না এবং তাঁহাদের সভায় বসা উঠা করিতেও ভাল বাসিতেন না। রাজাধিরাজ বাদসাদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কখনই দুঃখিত হইতেন না এবং তাঁহাদের দর্প, তেজ ও প্রতাপ দেখিয়া ভয়াতুর হইয়া পড়িতেন না। কোন বাদসা কি উজির দেখা করিতে আসিলে হটাৎ তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন না, যদি ভবিষ্যতে দেখা হইত তাঁহাদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। কখন অর্থশালী কি ধনবান বাদসালোকের মনরাখা কথা বলিতেন না এবং তাঁহাদের অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেন না। কখন ধনবান, অর্থশালী, আমির, উজির, বাদসার পুরস্কার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। কোন লোক কোন সময়ে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া কুপথগামী করিতে পারিতেন না। কখনই করুণাময় খোদাতায়ালাকে বিস্মরণ হইয়া পৃথিবীর মায়াঘোরে আশক্ত হন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমার যুবাকালে একদিন পথে যাইতে যাইতে একটী যুবতীকে দেখিতে পাইলাম, সেই মায়াবিনী আমার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া

উঠিল। আমি মস্তক হেঁট করিয়া চলিয়া আইলাম, আমার উপাসনালয়ে আসিয়া দেখি যে একটী পরম-সুন্দরী জঞ্জাল মুক্ত করিতেছে! পরদিন প্রাতঃকালে আমার মাদরাসায় যাইয়া দেখি, সেই মায়াবিনী রমণী ঝাট দিতেছে; তখন তাহাকে বলিলাম, রে মায়াবিনী তুই কে? সে কহিল, আমি পৃথিবী, তোমাকে ভুলাইবার জন্য প্রত্যহ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। তখন তাহাকে বলিলাম, দূরহ, পাপীয়সী! সেই দিন হইতে মায়াবী পৃথিবী আমার নিকটে আসিতে আর সাহস পাইল না।

বড়পীর সাহেবের পরিচ্ছদের বিবরণ।

সেরাল আরফিন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মখদুম আশরফ জাহান বলিয়াছেন, হজরত মহবুবে সোবহানি সময়ে সময়ে শত শত ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিনাকারণে মুক্তিদান করত, গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা দিয়া, সাধু-পদে অভিষেক করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাহারাও সাধুত্ব লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। আবুল মজাফ্ফার বলিয়াছেন, তাঁহার দরবারে প্রত্যহ শত সহস্র সাধু, ফকির, গরিব, অনাথা ও নিরাশ্রয় লোক থাকিত, তিনি তাহাদের সহিত এমন মাধুর্য্য ভাবায়

বাক্যালাপ করিতেন যে, তাহাতে সকলেই মনে করিত পীর সাহেব সর্ব্বজন অপেক্ষা আমাকেই অধিক ভাল বাসেন। সর্ব্বদা দারিদ্র লোকের সঙ্গে আহার করিতেন ও তাহাদের সঙ্গে উঠা বসা করিতেন, কেহ কোন বস্তুর প্রার্থনা করিলে তাহাকে বৈমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিতেন না। দাস দিগকে কখন কড়া কথা বলিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিতেন না, তাহারা কোন ক্ষতি করিলে, তাড়না না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। কোন দাসকে বেশী পরিশ্রম করাইয়া লইতেন না এবং তাহাদের কোন বস্তুর অনাটন হইলে সময়ে সময়ে দিয়েও সাহায্য করিতেন। তিনি পার্থিব ভোগ বিলাসে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন। তাঁহার আহার্য্য ও পরিধেয় পরিচ্ছদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ জাঁক-জমক বিহীন অতি অল্প মূল্যের ফকিরী সাজসয্যা ছিল; তবে পরিধেয় জামা লম্বা মৌলবীগণের পিরহানের মত। কখন কখন বেশী মুল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়া পরিধান করিতেন। কথিত আছে একবার কোন বনিক বেশী মূল্যের বস্ত্র বোগদাদ অধিপতি সম্রাটের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রের অধিক মূল্য বলিয়া বনিককে ফিরাইয়া দেন; কিন্তু সেই বেশী মুল্যের বস্ত্র বড়পীর সাহেব ক্রয় করিয়া

পরিধান করেন। আবার সময়ে সময়ে এক আশরফি মূল্যের গজের কাপড় ক্রয় করিয়া পরিচ্ছদ সেলাই করাইতেন। আবুল ফজল বজাজ বলিয়াছেন, একদিন হজরত বড়পীর সাহেবের একটী দাস আমার দোকানে আসিয়া একদিনার মূল্যের গজের থান কাপড় চাহিলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত উচ্চ মূল্যের বস্ত্র কাহার জন্য চাহিতেছ? তখন সে কহিল, হজরত বড়পীর সাহেবের জন্যে আবশ্যক। তখন আমি মনে মনে বলিলাম এ কাপড় বাদসা লোকের যোগ্য, ফকির লোককে পরিধান করা উচিৎ নয়, তিনি ফকির লোক হইয়া এরূপ কিম্মতি বস্ত্র ব্যবহার করিতে কি লজ্জাবোধ করিবেন না? এইরূপ কথা বলিতে বলিতেই আমার পায়ে শুই ফুটিয়া গেল, জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলাম, সে শুইটী কিছুতেই বাহির হইল না। পরদিন পাল্কীতে আরোহণ করিয়া পীরদরবারে যাইয়া পৌঁছিলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে বনিক তনয় আবুল ফজল! কে আমির কে ফকির, তাহা তোমার অত বিবেচনা করিবার কি আবশ্যক ছিল এবং আমাকেই বা তোমার এত তাচ্ছিল্য ভাবিবার কারণ কি? তোমার নিজের দোষেই তুমি দৈব যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছ। ছি এমন নীচ প্রবৃত্তিকে কখনই

মনে স্থান দিও না এবং ফকির লোকের প্রতি কখনই মন্দ বলিও না। এই বলিয়া তিনি আমার পদে হাত বুলাইতেই শুই বাহির হইয়া গেল; জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যাথা সকল নিবারণ হইয়া, পীরের কৃপায় আরোগ্য হইলাম। পরে পীরের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা লইয়া, তাঁহার চরণ ধুলা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

বড়পীর সাহেবের আহার্য্যের বিবরণ।

আবু আব্দোল্লাহ্ বলিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের নির্দ্দিষ্ট করা কিঞ্চিৎ জমি ছিল, তাহা কেবল নিজের জীবিকার জন্য রাখিয়াছিলেন, সেই জমি স্বয়ং চাকর সঙ্গে লইয়া চাষ করিয়া ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করিতেন। সেই ক্ষেত্রের সমুদয় শস্য নিজের আহার্য্যের জন্য রাখিয়া দিতেন। সেই জমির শস্য হইতে প্রত্যহ চারটী রুটী প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে একটী রুটী সহচর দিগকে খাইতে দিতেন ও তিনটী রুটী নিজে আহার করিতেন। বিনা ওজুতে, এবং অতিথি ভোজন না করাইয়া আহার করিতেন না। প্রতিবাসীগণ কখন কোন বস্তু খাইতে দিলে তিনি তখনই গ্রহণ করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। কিন্তু শুদ্ধ বস্তুর তওফা ব্যতীত অপবিত্র বস্তুর তওফা গ্রহণ করিতেন না।

যদি কোন সময়ে কোন বড়লোক কি বাদসা কি উজির খাদ্য দ্রব্য পাঠাইতেন, কি কাফারার বস্তু হুজুরকে দিতেন, তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না। খেদমতগার দিগকে আদেশ করিতেন, উহা ফকির মিস্‌কিন দরিদ্র বালক দিগকে বণ্টন করিয়া দিতে। কখন উপবাস থাকিয়া রাত্রে দিন কাটাইয়া দিতে, কখন বা চল্লিশ সের আটার রুটী ও চল্লিশ সের কাবাব করা মাংশ খাইয়া ফেলিতেন। আবার এমন সময় উপস্থিত হইত যে সপ্তাহ. কাল উপবাসে থাকিয়া না খাইয়াও দিন কাটাইতে হইত। তথাপি কাহারও নিকট কোন বস্তু চাহিয়া খাইতেন না। আহাম্মদ বোগদাদি হুজুরের খেদমতগার বলিয়াছেন, এক সময় পীর সাহেব জীবিকার নিরূপায় হইয়া দয়াময় প্রতিপালকের সাহায্যের প্রতি নির্ভর করিয়া বসিয়াছিলেন। আচানক একজন অপরিচিত লোক আসিয়া, এক তোড়া স্বর্ণ মোহর সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই তোড়ার মোহর গুলি আপনার খরচের জন্য দিলাম ; এই বলিয়া তখনই সেই লোকটী দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। পরে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, ঐ লোকটাকে তোমরা কি চিন ? উনি স্বর্গীয় দুত। আজ আমি তোমাদের মাহিনা দিবার জন্য চিন্তা করিতে ছিলাম, আমার প্রতিপালক আমাকে

ঐ মোহর গুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা হইতে তোমাদের বাকি মাহিনা আদায় করিয়া দিব। আবার কোন সময়ে বাজারের অতি আবশ্যক হইয়া পড়িলে, বাজারে যাইয়া তাহা ক্রয় করতঃ নিজেই মস্তকে করিয়া বহিয়া আনিতেন। কোন সময়ে খেদমতগার (গোলাম) বিমার পড়িলে, নিজেই হাট বাজার করিতেন, গেহু পিসিয়া আটা বাহির করিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া খাইতেন। মেহমান (অতিথি) সৎকার নিজেই করিতেন, তাঁহদের জন্য কাহাকেও বেশী কষ্ট পাইতে হইত না। আপনি খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও মাংস অধিক ভাল বাসিতেন। সদা সর্ব্বদা বিনা লবণে আহার করিতেন; কাহাকে কোন বস্তুর উপলক্ষ করিয়া অধিক কষ্ট দিতেন না। একবার সাতটী পয়সার মেঠাইর জন্য সাতজন বালককে বাজারে পাঠাইয়া, নিজে পথের ধারে তাহাদেব অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারা ফিরিয়া আসিলেই সকলেব মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দোওা করিয়াছিলেন।

বড়পীর সাহেবের তপস্যা করিবার বিবরণ।

আদর্শ সাধুপুরুষ হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জিলানী সরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত এই চারি প্রকার বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন, এবং সালেহিন সাধুপুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণে অগ্রগণ্য। তিনি বিনা অবগাহন ও ওজু ব্যতীত, নিয়মিত পঞ্চ সময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ করিতেন না। প্রত্যেক নিয়মিত উপাসনা সমাধা করিবার জন্য নব ওজু করিয়া লইতেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এক ওজুতেই সকালের ও প্রভাতের নামাজ পড়িয়া ছিলেন। সমস্ত রজনী নিদ্রা ত্যাগ দিয়া বিশ্বপালক জগদীশ্বরের অর্চ্চনা আরাধনায় মননিবেশ করিতেন। অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রজনীযোগে একপদে দাঁড়াইয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ করিতেন। ভোরের সময় দ্বাদশ রেকাত তাহজ্জদ নামাজে কোরাণ খতম করিয়া সকলের পূর্ব্বে দুইশত রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া, এই দোওা পাঠ করিতেন; "আল্ মোহিজোল্ আলেমোল হাসিবো আল্ গায়্য়ালো আল্ খালেকোল বাবিইয়ো আল্ মোছাব্বেরো" ইহা বার বার পাঠ করিতে করিতে অদৃশ্য

হইয়া শূন্যভরে আকাশে উড়িয়া যাইতেন এবং আকাশ হইতে নিম্নে আসিয়া, খোদাতায়ালাকে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। পরে সকাল হইলে ফরজ নামাজ সমাধা করতঃ কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া, অজিফা ও অন্যান্য জেকের উপাসনায় লিপ্ত থাকিতেন। তিনি রাত্রিকালে তাহাজ্জদ পড়িয়া তৎপরে চেহেল আসমা দোওা তিন শত ষাটবার এবং দোওা সফি, দোওা বানতাহায়াজ্ মত, দোওা বানতাহা আতরত, দোওা সায়ফোল্লাহ্ প'ড়িতেন। চাশ্‌ত নামাজ সম্পূর্ণ ক'রিয়া আজমতে কেবির নামক দোওা বারো বার পাঠ করিতেন। জোহরের নামাজ পড়িয়া, দরুদ তাজ, দরুদ আকবর, নিরানব্বুই নাম খোদাতায়ালার ও নিরানব্বুই নাম মহাম্মদের জপ করিতেন। যখন তিনি যোগবলে মোহ্‌হেদ মোকাম তৌহিদ স্থানে পৌঁছিতেন, তখন তাঁহাকে, কেহ দেখিতে, পাইত না অদৃশ্য থাকিতেন, সে সময় তিনি না খোদা, না তাঁহা হইতে পৃথক, না স্বর্গীয় দূত, না দেব, না দৈত্য, না দানব, না মানব, না মারফতে, না শরিয়তে, না গোপনে, না প্রকাশ্যে, না স্বর্গে, না নরকে, না আলোকে, না অন্ধকারে, না আকাশে, না পৃথিবীতে, না গৃহে, না বসিয়া, না দাঁড়াইয়া, না এস্‌লামে না কুফরিতে, না মুসলমান, না হিন্দু, না অর্চ্চনায়, না

বিস্মরণতায় ইহার কিছুই নির্ণয় করিবার কাহারই সাধ্য থাকিত না। তাঁহার বিষয়ে খোদাতায়ালা ব্যতীত কাহার সাধ্য নাই যে স্থির সিদ্ধান্ত করেন এ বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালাই সর্ব্বজ্ঞ। আর তিনি সদা সর্ব্বদা এই দোওা পাঠ করিতেন।

আরবী দোওা।

কুত্তা কোলুবোল মোস্তাকিনা লাহাওলা ওালা ওাকুত্তা কোলুবোল আশেকিনা লাএলাহা ইল্লাল্লাহো।

হজরত বড়পীরের নিদানকাল।

বেহজাতল আসরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ সাহাবদ্দিন, সহরর্দ্দি বলিয়াছেন, হিজরির পাঁচশত একষট্টি সালে রবিওল আওাল মাসে হজরত বড়পীর সাহেব কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। দিনে দিনে ক্রমেই জরা জীর্ণ হইয়া অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার পরমাসে রবিওস্ সানি শুক্রবার দিবস হইতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া হাড়মাসে জড়িভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শেষদশা দর্শন করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে শত শত সাধু, দরবেশ, ধনি, নির্ধনি, আলেম, পণ্ডিত, জ্ঞাতি ও শিষ্যগণ আসিয়া চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

কেহবা সর্ব্বাঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, কেহবা পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন, কেহবা পীরের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় ! এবার বুঝি গুরুদেব আমাদিগকে জন্মের মত শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবেন। তিনি শিষ্যগণের কাতর বচনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমি জগতের সকল লোক হইতে নির্ভয়ে আছি, এবং মৃত্যু-পতি শমনকেও ভয় করি না। তৎপরই আবার বলিলেন, তোমরা স্থান প্রশস্ত কর ; সাবধান সতর্ক হও, নিঃশব্দ হইয়া আদবের সাথে বস। আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, দয়াময় দয়ার দ্বার মুক্ত করিয়াছেন। আমার সাক্ষাৎ-লাভে দলে দলে স্বর্গীয় দূতগণ স্বর্গ হইতে আসিতেছেন ; ঐ দেখ, প্রেরিতপুরুষগণ একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি মুহুর্মুহু বলিতে লাগিলেন, ওা আলায়কা আচ্ছালামো ওা রহমাতুল্লাহে ওা বরাকা-তুহু, ওা গফারাল্লাহো ওা লাকুম ওাতাবা আলা আলায়কুম।

সন্তান ও শিষ্যগণকে অন্তিম কালের উপদেশ শুনাইবার বিবরণ।

আনওার আহাম্মদি গ্রন্থে লিখিত আছে, সৈয়দ

আহাম্মদ বলিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের নিদানকালে, সৈয়দ আব্দোল ওহাব বিনয় বচনে পরম পূজনীয় পিতৃ-দেবকে বলিলেন, পিতঃ! এই হতভাগ্য সন্তান দিগকে শেষ উপদেশ দান করুন। তখন তিনি বলিলেন, বৎসগণ! আমি অন্তিম সময়ে তোমাদিগকে কতকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা তোমরা মনযোগের সহিত শ্রবণ কর। ভ্রমে কখনও পাপ পথে পদার্পণ করিয়া কুপথগামী হইও না। অনিত্য সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অবৈধ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া সঞ্চিত সৎকর্ম্ম নষ্ট করতঃ, পরকালের পথে জলাঞ্জলি দিও না। ঐকান্তিক ভক্তিসহ প্রকাশ্যে ও গোপনে করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার অর্চ্চনা উপাসনা করিবে, এবং নিরূপিত পঞ্চবার নামাজ পড়িয়া শরিয়তের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইবে। সেই শাসনকর্ত্তা খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিও না এবং এ জীবনের আশা, ভরসা, দুঃখ, সুখ, ভাল, মন্দ, অনাটন ও অভাব যখন যাহা ঘটে তৎ সমুদয় তাঁহার উপরেই নির্ভর করিও। আপদে বিপদে পড়িয়া কখনই তাঁহার অংশি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইও না। কেননা তিনি একেশ্বর অংশিহীন; এই একেশ্বর ধর্ম্ম প্রচার করিতেই পীর, পয়গম্বর, মুনি, ঋষি, মহর্ষি, সাধু, বিদ্বান ও আলেমগণ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে যদি কোন লোক আমার বিনিময়ে খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করে, অবশ্য দয়াময় দয়া করিয়া তাহাকে আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যখন এরূপ করিলেও রক্ষা না পাইবে তখন একান্ত ভক্তিসহ দুরেকাত নফল নামাজ পড়িয়া সুরা এখলাছ একাদশবার, দরুদ শরিফ এগারবার পাঠ করিয়া, আমার নাম এগারবার বলিতে বলিতে এগার পা এবাকাভিমুখে গমন করিবে পরে আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিবে যে, হে দয়াময় সৃষ্টি-কর্ত্তা আমার বাসনা পূর্ণ করুন। অবশ্যই কৃপাময় কৃপা করিয়া তাহার আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু যদি আমার নামে কোন বস্তু মানসিক করে কিম্বা আল্লা ব্যতীত আমার নিকট প্রার্থনা করে ত, মহাপাপী অংশীবাদী হইয়া নরকগামী হইবে।

হজরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন।

তশারেখ আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল ফতে বোগদাদী বলিয়াছেন যে, রবিবার গতে সোমবারের রাত্রিতে এশার সময়ে বড়পীর সাহেব স্নান করাইয়া দিতে বলিলেন; তাঁহার আদেশানুসারে পুত্রগণ স্নান করাইয়া দিলেন; তিনি অবগাহন ও ওজু করিয়া, এশার নামাজ সমাপ্ত করতঃ, তৎপরে একটী লম্বা সেজ্দা

কতক্ষণ পরে একটী অন্তিম প্রার্থনা করিলেন।

আরবী প্রার্থনা।

আল্লাহোম্মাগ ফেরলে উম্মাতে মহাম্মদেঁও
ওা আরহেম উম্মাতো মহাম্মদেঁও
ওাতাজাবেজ আন উম্মতে মোহাম্মদেন
ছাল্লাল্লাহে আলায়হে ওাচ্ছাল্লাম।”

হে করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা হজরত মহাম্মদের উম্মতগণের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহার উম্মতের প্রতি দয়াবারি বর্ষণ করুন। দয়াময় তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া দৈববাণী দিয়া বলিলেন, হে প্রিয় সখা! তোমার অন্তিম প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া হজরত মহাম্মদের (দঃ) উম্মতগণের পাপ ক্ষমা করিয়া দিলাম (১)। ইহার কতক্ষণ পরেই মৃত্যুপতি শমন আসিয়া, একটী লিপিবদ্ধ কাগজ লইয়া সৈয়দ আব্দোল ওহাবের করে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া, পিতার সম্মুখে ধরিলেন, তাহাতে আরবী অক্ষরে এই ঈশ্বরের পবিত্র মহা বাক্য লেখা ছিল।

হাজাল মাক্তুবো মেনাল মোহেব্বে এলাল মোহেবুবে।

(১) যাঁহারা হজরত মহাম্মদ সল্লাল্লাআলায়হে ছাল্লামের প্রকৃত উম্মত, তাঁহারাই মুক্তি পাইবেন।

অর্থাৎ আশকের পত্র মাস্থকের নিকটে প্রেরণ করিলাম, হে বন্ধু! বন্ধুবিচ্ছেদ হইতে শান্তিলাভ করিয়া বন্ধুর সঙ্গে মিলন করিতে শীঘ্র করিয়া আইস। তিনি এই পত্রটী পাঠ করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র মুখমণ্ডল স্থির, ধীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। একবার মাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া দুরন্ত কালকে ইসারা করিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন। তখন কৃতান্ত আজরাইল বড়পীর সাহেবের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। তিনি মহাবচন পাঠ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। পাঁচশত একষট্টী হিজরী রবিয়স্ সানি একাদশ তারিখ সোমবার দিবসে প্রাতঃকালে একানব্বুই বৎসর জগতে থাকিয়া, জগতের শান্তিদাতা আদর্শ বড়পীর সাহেব আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, পুত্র পৌত্র ও শিষ্যগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিলে, সকলেই বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে সমুদয় আরব ও আজম নিবাসী মানবগণ শোকে অধীর হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৈয়দ আব্দোল ওঁহার পিতার শবদেহকে স্নান করাইয়া সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিবার পরে শুভ্রবস্ত্রে ঢাকা দিয়া বোগদাদ নগরেই সমাধিস্থ করা হইল।

অদ্যাবধি সাধুগণে সকলেই সেই সমাধিস্থানে জিয়ারত করিয়া থাকেন। কিন্তু যে লোক অহঙ্কার বশতঃ, সেই পবিত্র মহা সাধুপুরুষের কবর জিয়ারত না করেন, তথনই তাঁহার ফকিরী সাধুত্বগুণ লোপ পায়।

হজরত বড়পীর সাহেবের সন্তান সন্ততিগণের বিবরণ।

বেহ্‌জাতল আসবার নামক গ্রন্থে শেখ শাহাবদ্দিন সহরর্দ্দাদি রহমাতুল্যা আলায়হে লিখিয়াছেন; হজরত বড়পীর সাহেবের বাইশজন কন্যা আর দশজন পুত্র সন্তান। প্রথম পুত্র সৈয়দ আব্‌দোল ওহাব তাঁহার পাঁচশত বাইশ হিজরীর সাবান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং একাত্তর বৎসর জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার আর একটী অপর নাম সরফদ্দিন আবু আব্‌দোল্যা। দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ শরফদ্দিন, ইনি পাঁচশত তিয়াত্তর হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তৃতীয় পুত্র সৈয়দ শামসদ্দিন, ইনি পাঁচশত আটাম হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ সেরাজদ্দিন, ইনি পাঁচশত তিয়াত্তর হিজরীর সতরই শাবাণ মাসে সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন। পঞ্চম পুত্র সৈয়দ আব্‌দুর রেজাক পাঁচশত আটাশ হিজরীতে জন্ম হয়, আর পাঁচ-

শত তেত্রিশ হিজরীর ৬ই তারিখে সওাল মাসে পৃথি-বীর মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ পুত্র সৈয়দ এব্রাহিম, ইনি বোগদাদ নগরে ছয় শত হিজরীব পাঁচিশে জেলকদ মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার দ্বিতীয় নাম আবুলহক। সপ্তম পুত্র সৈয়দ আব্‌দোল্লাহ্, ইঁহার দ্বিতীয় নাম আবু আব্‌দোর রহমান। ইঁনি পাঁচশত আট হিজরীতে ভূমিষ্ট হন, আর সাতাশ বৎসব জীবিত থাকিয়া, পাঁচশত সত্তর হিজরীর একুশে সফর মাসে নশ্বর জীবন ত্যাগ করেন। অষ্টম পুত্র হজরত আবুল ফজল সৈয়দ মহাম্মদ, ইঁনি ছয়শত হিজরীর সাতাশে রোমজান মাসে বোগদাদ নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নবম পুত্র সৈয়দ এহিয়ে (রঃ) ইঁনি পাঁচশত পঞ্চাষ হিজরীর ৬ই রবিওলআউয়ল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ছয়শত হিজরীতে পবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। দশম পুত্র সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আবুনসর, ইঁনি পাঁচশত ঊনচল্লিশ হিজরীর রবিওলআউওল মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরে দামেস্ক যাইয়া বসবাস করেন, ছয়শত একাদশ হিজরীর জমাদিয়ল আখের মাসে দামেস্ক সহরেই পরলোক গমন করেন। ঐ মহাত্মাগণের বংশ হইতেই অদ্যাবধি জগতে বড়পীর সাহেবের বংশাবলী অনেক স্থানে রহিয়াগিয়াছেন ঐ

বংশাবলী দিগের বর্ণ গুরুগণকে আমার শত শত প্রণিপাত।

বড়পীরের হস্তে মনকের নকিরের বন্দি হইবার বিবরণ।

আকতাবাল আসরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে; যখন হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জিলানী রহমাতুল্যা আলায়হে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। সেই সময় শত শত সাধুপুরুষ দেশ বিদেশ হইতে কবর জিয়ারত ভক্তি দর্শন করিতে আসেন। একজন মহা পরাক্রম মাবফতী মহর্ষি বিদেশ হইতে হজরত বড়পীরের সমাধি জীয়ারত করিয়া, রজনীকালে সমাধিস্থ স্থলে শয়ন করিয়াছিলেন। আবু মহাম্মদ বোস্তামি .(রঃ) বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি সাধুপুরুষ রজনীযোগে স্বপ্নে বড়পীর সাহেবকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আপনি মনকের নকির প্রশ্নকারী স্বর্গীয় দূতদ্বয়ের প্রশ্ন হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইলেন। তখন তিনি একটু ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, হে মহর্ষি! এরূপ প্রকার জিজ্ঞাসা না করিয়া, বরং আমাকে এরূপ প্রকার জিজ্ঞাসা করুন মনকের ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় কেমনে আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইল। তখন সেই

পরম তাপসিক সাধুপুরুষটী বলিলেন, মহাত্মন ! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার মহাঐশী-শক্তি বুঝিতে না পারিয়া, আপনাকে এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি? এখন এ অকৃতজ্ঞের প্রতি সদয় হইয়া বলুন যে, আপনার হস্ত হইতে সেই সুচতুর প্রশ্নকারী ফেরেস্তাদ্বয় কিরূপ প্রকারে রক্ষা পাইল। তখন পীর সাহেব বলিলেন, ভ্রাত। মৃত্যুর পর একটী বড়ই কঠিন সময় নির্দ্ধারিত আছে, কেননা পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় লোক বল, সহায় বল, সকলই পাওয়া যায়, সাহায্যকারীরও অভাব থাকে না; আত্মিয় বন্ধু বান্ধব সকলেই চতুস্পার্শে ঘেরিয়া থাকে। কিন্তু মৃতকে কবর মধ্যে রাখিয়া আসিলে সেই নির্জ্জন অন্ধকারময় কবর গৃহে কেহই সাহায্যকারী থাকে না; উহা কি ভয়ানক সময়, যাহা মনে হইলে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া যায়। যখন আমার আত্মিয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এই কবর মধ্যে একাকী রাখিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন, এমন সময় প্রশ্নকারী ফেরেস্তাদ্বয় ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধারণ করিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কবর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে ভীমরবে জিজ্ঞাসা করিল, "মানরাব্বোকা" তোমার প্রতিপালক কে?" মান নাবিয়েকা, তোমার নবি প্রেরিত পুরুষকে? "মান দিনোকা, তোমার ধর্ম্ম কি?

তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা কি মুসলমান? না অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী? তখন উভয়েই বলিল, আমরা মুসলমান বৈকি। তখন আমি বলিলাম, মুসলমানের লক্ষণ কি? প্রথম সালাম করা, দ্বিতীয় মোসাফা করা, পরে অন্য কথা বলা, তোমাদের এ দুয়ের একটাও হইল না; আর বল আমরা মুসলমান। এমন প্রথা কোন দেশে আছে যে বিনা সালামে বিনা মোসাফায় মমিন হইয়া মমিনের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহে। তখন তাহারা আমার কথায় লজ্জিত হইয়া, অগ্রে সালাম করিয়া, পরে মোসাফা করিল। আমি অমনি দুই জনের হস্ত ধরিয়া বলিলাম, হে প্রশ্নকারী ফেরেস্তাদ্বয়! প্রথমে তোমরা আমার সওয়ালের জবাব দাও। পরে তোমাদের প্রশ্নের প্রতিউত্তর পাইবে। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া, করযোড়ে বিনয় বচনে আমাকে বলিল, আচ্ছা! কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যখন সর্ব্ব শক্তিময় সৃষ্টিকর্ত্তা আদি পুরুষ আদম আলায়হেচ্ছালামকে সৃজন করিবার মানসে, তোমাদিগকে এই পবিত্র বচনে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন।

"ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খালিফাতান।" অর্থাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাইব (১)

(১) সুরা বকার চার রুকুর প্রথমে

তখন তোমরা বলিলে, তুমি কি তথায় এমন লোক সৃজন করিবে যে, সেখানে যাঁহারা শান্তি ভঙ্গ, রক্তপাত করিবে? অতএব আমরা তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকি ও পবিত্রতা স্বীকার করি। এরূপ ভাবে খোদাতায়ালাকে যখন প্রতিউত্তর দিয়াছিলে, তখন তোমাদের এ কথায় কি তাঁহার আদেশের অমান্য করা হয় নাই, এ কথায় তোমাদের অপরাধ, গৌরব, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইয়াছিল কিনা। প্রথম তোমরা মনে করিয়াছিলে যে, খোদাতায়ালা আমাদের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবে, তজ্জন্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অনাদি অনন্তময়, যিনি নিজের মন্তব্য হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি কখন কাহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন না, কেবল তোমাদের মন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দ্বিতীয় তোমরা আপনাদিগকে উত্তম জানিয়া, সকল মানবগণকেই বিবাদী অত্যাচারী, রক্তপাতকারী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। কিন্তু তোমরা ইহা বুঝিলে না যে, মানবগণের মধ্যে এমন লোক অনেক হইবে, যাহারা সাধুতায় তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে। তৃতীয় তোমরা এরূপ অনুমান করিয়া বলিয়াছিলে যে, প্রথমেই জেনেরা যখন পৃথিবী মধ্যে গিয়া অত্যাচারী হইয়াছিল, তখন

আদমের বংশগণ খোদাতায়ালার অর্চ্চনা না করিয়া দৈত্যগণের ন্যায় অত্যাচার করিয়া বেড়াইবে। যখন তোমরা এরূপ ভাবিয়া, জ্ঞানময় খোদাতায়ালার জ্ঞান অপেক্ষা নিজেদের জ্ঞান অধিক ভাবিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে এই পবিত্র বচনের দ্বারায় চৈতন্য করিয়া দিবেন।

আয়েত।

কালা ইন্নি আলামো মালা তালামুন।

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানিতে পার নাই। যখন তোমরা এরূপ প্রভু কর্ত্তৃক জ্ঞানময় বাণী প্রাপ্ত হইলে, তখন তোমরা নিঃশব্দ হইয়া চুপ করিয়া রহিলে। কেমন এ কথা সত্য কিনা? এখন তোমরা, আমার এ প্রশ্নের প্রতিউত্তর দিয়া, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমার নিকট হইতে অবশ্যই লইতে পার, নতুবা আমি কখনই তোমাদের হাত ছাড়িয়া দিব না। মনকের ও নকির পীরের মুখে এরূপ নিজেদের পুরাবৃত্ত অসম্ভব প্রাচিন কথা শুনিয়া এক বারেই তাজ্জব হইয়া পড়িল এবং তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সওালের জবাব দিবার জন্য বুদ্ধি খাটাইয়া দেখিতে লাগিল। কোন প্রকারে তাহাদের জ্ঞানে আমার কথার উত্তর দিতে

যোগাইল না বলিয়া, শেষে আমার হাত হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টাও পাইতে লাগিল। তাহাদের সেকুট বুদ্ধি পলকেই লয় পাইয়া গেল। অবশেষে সকল দিকেই নিরুপায় হইয়া, মনকষ্টে ছল ছল নেত্রে এ উহার মুখদিকে চায়, সে তাহার দিকে দৃষ্টিকরে। দর্শকগণ তখনকার তাহাদের সে ভাব দর্শন করিলে সত্য সত্যই মনে করিবেন, নাজানি ইহারা কতই অপরাধি হইয়া আজ চোরের মত পীরহস্তে বন্দী। তাহারা আদিপুরুষ হইতে এযাবৎ-কাল যে, প্রশ্ন করিয়া আসিতেছিল, একদিনের তরে এমন কঠিন ভাবে কাহারও হস্তে বন্দী হয় নাই এবং এরূপ দুর্দ্দশা সংঘটন হইবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই, অবশেষে পলাইবার জন্য আর একটী বুদ্ধি খাটাইয়া আমাকে কহিল, কেবল আমরা দুজনে ত একথা বলিনাই; আমরা সমুদয় ফেরেস্তাগণ একত্রে হইয়া বলিয়াছিলাম। তবে কেমন করিয়া দুইজনে এ কথার জবাব দিতে পারিব? এখন আমাদের দুইজনকে ছাড়িয়া দিন। একটু পরে সকলের নিকট হইতে জবাব আনিয়া আপনার কথার প্রতিউত্তর করিব। তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলাম, তোমরা যদি ফিরিয়া আর না আইস, তখন আমি তোমাদের দেখা কোথায় পাইব তবে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, একজনকে ছাড়িয়া দিতেছি।

সকলের পক্ষ হইতে জবাব আনিয়া দাও। তাহারা তাহাতেই স্বীকার পাইলে, আমি মনকের কে ছাড়িয়া দিলাম। সে তখনই স্বর্গে গিয়া সকল ফেরেস্তার নিকটে উক্ত প্রশ্ন প্রকাশ করাতে তাঁহারা প্রমাদ গণিয়া পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিল। কেহই তাঁহার কথার কোনই উত্তর করিতে পারিল না, তখন মনকের দয়াময় খোদাতায়ালাকে জানাইল, হে অনাদি অনন্ত-ময় অন্তর্য্যামী। এ দায় হইতে রক্ষা করুন, আজ আপ-নার দুতগণ বিষম সমস্যায় পতিত। নিরুপায় দিগের মানব হস্তে রক্ষা পাইবার উপায় করিয়া দিন তখন প্রভু বাণী হইল, তোমরা আদম আদিপুরুষের সময়ে যে কথায় আপত্তি করিয়া অপরাধি হইয়াছিলে, তাহা আজ তাঁহার বংশাবলী মহা তাপস প্রবর বড়পীর সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। এখন তোমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেন না তিনি যে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ক্ষমা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তোমাদের সকলই দায়িত্ব হইয়া রহিবে। অনন্তর সমুদয় স্বর্গীয়দূতগণ একে একে সকলেই আমার নিকটে আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া, নিজেদের দোষ স্বীকার পাইয়া, অপরাধ মার্জ্জনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি হটাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা না করায়, দয়াময়

খোদাতায়ালার আদেশ হইল, হে সখা! আমার ফেরেস্তাগণকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে গর্ব্ব করিয়া বলিলাম, দয়াময় করুণাসিন্ধু! আজ উপযুক্ত সময় পাইয়াছি? অগ্রে আপনি স্বীকার করুন যে, মনকের নকির প্রশ্নকারী-দ্বয়ের প্রশ্ন হইতে আমার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য এরূপ পরম্পর শিড়ি অনুযায়ী সেজরা দৃষ্টান্ত শিষ্যগণ, যদি উহাদের প্রশ্ন হইতে নিরাপদ থাকে, তবে আমি এখনই উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। তখনই প্রত্যাদেশ হইল হে সখা! তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলাম, উহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দাও। তখন আমি তাহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম। তবে প্রশ্নকারী ফেরেস্তাদ্বয় আমার হস্তে মুক্তিলাভ করে।

বড়পীর সাহেব কবর হইতে তিন শত লোককে মুরিদ করেন।

আখিয়ারাল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল ফাতেহ্ (রঃ) বলিয়াছেন যে, দামেস্কের অধিবাসী একজন ধনাঢ্য বণিকের বাসনাছিল যে, বড়পীর সাহেবের হস্ত স্পর্শ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়া লইব।

কিন্তু বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত থাকায় নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া, ক্রমান্বয় বিলম্ব হইয়া পড়িল। এদিকে বড়পীর সাহেব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই বনিক তনয় সংসার কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া, আপনার দলবল সহকারে বোগদাদ শরিফে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়া লোকমুখে বড়পীর সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার মাজার শরিফ জিয়ারত করিতে সমাধিস্থানে প্রবেশ করিয়া কেবল চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল, ক্রমে রাত্রে হইয়া গেল, তথাপি চৈতন্য হইল না, কাজেই তাহার সঙ্গিগণ মাজারা শরিফেই রহিয়া গেল। পীরসাহেব তাহার ভক্তিতে আবদ্ধ হইয়া, বনিকের মনোবাঞ্ছা পুরাইতে স্বর্গীয়কায় কবর হইতে উত্থান হইয়া হস্ত প্রসার করিয়া দিলেন। তখনই বনিক-তনয় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, হুজুরকে সালাম করিয়া দাঁড়াইল। হজরত বড়পীর সাহেব তাহার হস্ত ধরিয়া (বয়েত) অনুশ্মরণ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া দিলেন। তখন একে একে বনিকদলস্থ সমুদয় লোক হজরতের হস্তে হাত দিয়া মুরিদ হইয়া গেল। বনিকতনয়কে লইয়া তিনশত একজন লোককে মুরিদ করিয়া, তাহাদিগকে মারফতি (গুপ্তধনে) বিভূষিত

করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। পাঠকগণ! নিশ্চয় জানিবেন সাধুপুরুষগণ খোদাতায়ালার নিকট জীবিত, তবে পৃথিবীর লোকের নিকট অদৃশ্য।

একজন মহাপাপী বড়পীরের কবরের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া মনকের নকি-রের হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

সরে নছুছ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবু সৈয়দ কিল্লুলি হইতে বর্ণিত হইযাছে যে, বোগদাদ নগরে একজন মহা দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা বাস করিত, তাহার পাপ কার্য্য ব্যতীত পুণ্য কার্য্য কখনই ছিলনা, সর্ব্বদাই পাপ কর্ম্মেই লিপ্ত থাকিত। এমন কি সুরাপান, পরদার হরণ, নৃত্য, গীত, আমোদ প্রমোদ সকলই করিত, জন্মে নামাজ, রোজা, দান-খায়রাত, এ সকল সৎকর্ম্ম কিছুই করে নাই এবং মুরিদ হইয়াও ছিল না। কিন্তু হজরত বড়পীর সাহেবের উপর যারপর নাই ভক্তি ছিল। সেই পাপী যখনই কোন কার্য্যে গমন করিত, তখনই স্নান করিয়া পীরের মাজার শরিফ গিয়া বৃক্ষের পাতা, জঞ্জাল ইত্যাদি মুক্ত করিয়া দিত। পরে অন্য কাজে গমন করিত। এইরূপ প্রকারে কবরের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া জীবন কাটাইয়া অবশেষে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া

মৃত্যু হইল। গ্রামবাসীগণ তাহার সৎকার্য্য করিয়া কবর দিয়া আসিলে, মনকের ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কবরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, রে মানব-তনয়! তোমার প্রতি-পালক কে? তখন সে কহিল, যিনি সমুদয় জীবগণকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তিনিই আমার পালনকর্ত্তা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নবি কে? উত্তর হইল, আব্দোল কাদের জিলানী। বিপরীত উত্তর শুনিয়া ফেরেস্তাদ্বয় অবাক হইয়া রহিল। আবার প্রশ্ন করিল, তোমার ধর্ম্ম কি? সেত ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিত না, তবে ধর্ম্ম প্রচারক বড়পীর সাহেব কে জানিত। সেই জ্ঞানে উত্তর দিল, আব্দোল কাদের জিলানী; তখন তাহারা তাহার বিপরীত জবাব শুনিয়া, কঠিন শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিল। অমনি অনাদি অনন্তময় অন্তর্য্যামী, কৃপাময় করুণাসিন্ধু, ফেরেস্তাদিগকে কহিলেন, ক্ষান্ত হও, ও ব্যক্তি সত্য সত্যই শাস্তি পাইবার উপযুক্ত বটে, কেন না জন্মেও কুকর্ম্ম ব্যতীত সৎকর্ম্ম করে নাই। তবে আমার সখা আব্দোল কাদের জিলানীর পরম ভক্ত ও আশক্ত এবং জগতে তদ্রূপ অনুযায়ী কার্য্য করিয়াও ছিল। নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে একদিনের জন্যেও বিস্মৃত হয় নাই। তজ্জন্য উহার সকল অপরাধ ক্ষমা

করিয়া দিলাম এবং উহার কবর প্রশস্ত করিয়া স্বর্গের তুল্য করিয়া দাও। দয়াময়ের অনুগ্রহে তখনই মহাপাপীর কবর স্বর্গের ন্যায় উজ্জল হইয়া গেল। অতএব বুঝা গেল যে, ভক্তিতেই মুক্তি।

সৈয়দ মুখ্‌দুম সাহেবের গুপ্তবিদ্যা বিনষ্ট হয়।

বেসালাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সৈয়দ হাশেম আলুই বিজাপুরি রহমাতুল্যা আলায়হে বলিয়াছেন, মখ্‌দুম বান্দহ্‌ নেয়াজ সাহেব, ইনি শরিয়ত, মারফত, হকিকত সকল প্রকার বিদ্যায় মহা বিদ্বান ছিলেন। ইঁহার বসবাস ডেকান মুল্লুকের নিকটবর্ত্তী গুলবর্গা শরিফ। একদিন হজরত মখ্‌দুম সাহেব আপনার কক্ষে বসিয়া শিষ্য ও অন্য অন্য লোক সহ কথোপকথন করিতেছিলেন। সেই সভায় নানাদেশের বিবিধ পীরসাহেব দিগের গুণকীর্ত্তন হইতেছিল। এক একজন এক একদেশের সাধুর বর্ণনা করিয়া মোজ্‌লেসকে গোলজার করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই মোজ্‌লেসে একজন বোগদাদ নিবাসি দেশ পর্য্যটনকারী মুন্সী বসিয়াছিলেন, তিনিও আমোদে উৎফুল্ল হইয়া, হজরত মহবুবে সোবহানি আব্‌দোল কাদের জিলানি বড়পীর সাহেবের

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কেরামতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বড়পীর সাহেবের কেরামতের কথা শুনিয়া, হজরত মখ্‌দুম সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, বাপু হে! তুমিত অজ্ঞলোক, সাধুগণের চরিত্রের বিষয় সকল কথাত বুঝিতে পার না। বড়পীর সাহেব তাঁহার সময়কালে পাঁচশত হীজরিতেই সাধুতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই সাতশত হিজরীর মধ্যে এখন আমি যে সাধুতায় সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাত তুমি জান না। যেমন তাঁহার মুখে এই কথাটী উচ্চারণ হইল, অমনি তাঁহার আলোকিত অন্তঃকরণে দৈব কালিমা পড়িয়া অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। পলকের মধ্যে বহুকষ্টের উপার্জ্জিত অমূল্য ফকিরী ধন লোপ পাইল। তখন তিনি মণিহারা ফণির মত অন্ধকারে হাত পা আছাড়ে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। মদগর্ব্বিত সাধু মুখ্‌দুম সাহেব একবারেই সঞ্চিত পুঁজি হারা হইয়া হায় হায় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় গেলে যে হারাধন প্রাপ্ত হইবেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া, আপন গুরুদেব হজরত রৌসন-জমির নছিরদ্দিন চেরাগ দেহ্‌লি রহমাতুল্লা আলায়হের নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনেক দিবসের পরে দিল্লি আসিয়া, আপন দুর্দ্দশার কথা

গুরুদেবের নিকট বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। হজরত নছিরদ্দিন চেরাগ দেহ্‌লি, বড়পীরের শানে বে আদবীর কথা শুনিয়া প্রথমে কাঁপিয়া উঠিলেন। পরে আপন শিষ্য মখ্‌দুম সাহেবকে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া বলিলেন, আমার ক্ষমতা নাই যে, তোমার সাহায্যের জন্য বড়পীর সাহেবকে কিছু বলিতে পারি। তবে তোমার সোপা-রেশের জন্য আমার গুরুদেব সোলতানল মশায়েখ নেজা-মদ্দিন রহমাতুল্লা আলায়হের নিকটে নিবেদন করি। এই বলিয়া তিনি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ধ্যান যোগে (মোরাকেবায়) আপন গুরুদেব নেজামদ্দিন সাহেবকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার পরমাত্মা উপস্থিত হইলে সকল ঘটনাই বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা একটা উপায় অবলম্বন করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি, প্রেরিত পুরুষ হজরত মহাম্মদ মস্তোফা (সঃ) কে সাধনাবলে আনয়ন করিয় তাঁহাকে বলিলেন, হে অকুলের কাণ্ডারী ভবপারের কর্ণধার। মখ্‌দুম্ বান্দা নিয়াজের উপায় কি হইবে বলুন ? তখন তিনি বলিলেন, বড়পীর সাহেবকে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিতে আমি পারি না, তবে জগজ্জননী ফাতেমা খাতুন আমার স্নেহের তনয়াকে ডাকাই। তখনই জগজ্জননী ফাতেমাদেবীর আত্মা উপস্থিত হইলে, হজরত রসুলোল্লা তাঁহাকে বলি-

লেন, মা ফাতেমা! তোমার বংশধর রত্নকুল চুড়ামণি আব্‌দোল কাদের জিলানী অবশ্যই তোমার কথা রক্ষা করিবেন। তুমি তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া, কৃত অপরাধী মখ্‌দুমের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিতে বল। হজরত ফাতেমা দেবী পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে, বড়পীর সাহেবকে আহ্বান করিলে, তিনি তখনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পবিত্রপুরুষগণের আত্মা একত্রিত হইলে যে কি মনোহর ভাব ধারণ করেন, তাহা পাঠক-গণ কখন যদি কেহ ভাগ্যগুণে, সেই পবিত্রপুরুষগণের একত্রিত ভাব স্বপ্নে কি যোগবলে কি ধ্যানে দর্শন করিতেন তবে জন্মের সার্থকতা লাভ করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন এবং সে মাধুর্য্যভাব বুঝিতে পারিতেন। ধন্য, মহাতাপসকুল চুড়ামণি নসিরুদ্দিন চেরাগ দেহ্‌লি ধন্য! তুমি জগতে যোগবলে যে রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে। বলি হে তাপস-প্রবর তুমিকি ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া কি দেহ্‌লির প্রদীপ হইয়াছ? না অন্য আর কোন গুণ ছিল? ধন্য তুমিই জগতে এই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছ। হও ধন্য হও। আমিও তোমার পবিত্র মাজার শরিফ ভক্তিভাবে দর্শন (জেয়ারত) করিয়া ধন্য হইয়াছি।

বড়পীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া, হজরত ফাতেমা

খাতুনে জেন্নাত (বাজি ভান্না আনহা) বলিলেন, হৃদয়রঞ্জ বৎস আব্দোল কাদের ! আজ তোমারি জন্য আমাদের সকলের আগমন। প্রাণাধিক ! এখন তুমি আমার বিনিময়ে, মখ্‌দুম বান্দা নিয়াজের অপরাধ মার্জনা করিয়া উহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। তখন তিনি বলিলেন, মা জগজ্জননী ! আপনার আজ্ঞা অবাধেই পালন করিব। তবে আমি ইচ্ছা করিয়া উহার ফকিরী ধন কাড়িয়া লই-নাই, উনি নিজের দোষেই সে ধন হারা হইয়াছে। এতদূর আস্পর্দ্ধা যে, আমা হইতে উচ্চপদ লাভ করিতে চায় এবং লোক সাক্ষাতে নিজের আত্মগরিমা করিয়া থাকে যাহা হউক এখন আপনার আদেশ মান্য করিয়া, উহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তৎপরে বড়পীর সাহেব মখ্‌দুম বান্দা নিয়াজের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, ভ্রাত মখ্‌দুম ! তুমি তোমার গুরু হইতে যে গুপ্ত ফকিরী ধন সংগ্রহ করিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি প্রাপ্ত হইলে এবং আমা হইতে দ্বিগুণ মারফতি গ্রহণ কর। আমি তোমাকে প্রসন্ন মনে দান করিলাম। গুরুদেবের সাহায্যে বড়পীরের কৃপায় মখ্‌দুম বান্দা নিয়াজ তৃতীয়-গুণ গুপ্তবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দমনে গুলবর্গা শরিফে ফিরিয়া গেলেন। হে পাঠকগণ। এই জন্যই উপযুক্ত সদ্‌গুণ বিভূষিত গুরুদেবের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া মনস্কামনা

সিদ্ধি করিতে হয়। হজরত মখ্‌দুমের উপযুক্ত গুরু হজরত নসিরদ্দিন চেরাগ দেহ্‌লি না থাকিলে, উঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইত (১)।

বড়পীর সাহেবের জুতা ও পিরহান চুরি করিয়া নবাবের নবাবি নষ্ট।

হজরত মহবুবে সোবহানি আব্‌দোল কাদের জিলানি বড়পীর সাহেবের বংশধর, সৈয়দ আবুল মজাফফার কাদরী দানাপুর নিবাসী ইঁহার গৃহে প্রায় ছয়শত বৎসর হইতে ক্রমান্বয় পরম্পার বংশাবলী বড়পীর সাহেবের একজোড়া জুতা ও একটী পিরহান সকলের কাছ হইতে, আবুল মজাফ্‌ফরের হস্তে পৌঁছিলে, ইঁনি অতি যত্ন সহকারে তাহাকে রক্ষা করিয়া রাখিলেন। সময়ে পাদুকাদুটী চখে মুখে লাগাইয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন। প্রতি বৎসরে রবিয়সসানির এগারুই তারিখে সেই অমূল্য পাদুকা দুইটী বাহির করিতেন ঐ দিন সহরের আমির, ফকির, গরিব ধনবান প্রায় শত শত লোক, তাহা দেখিবার

(১) হিন্দুস্থানের পাঞ্জাতনের মধ্যে নছিরদ্দিন একজন। প্রথম মইনদ্দিন চিশ্‌তি, দ্বিতীয় কোতোবদ্দিন বখতিয়ার কাকি, তৃতীয় ফরিদ-উদ্দিন গঞ্জেসকর, চতুর্থ নেজামদ্দিন জরিজর বক্স চিশ্‌তি, পঞ্চম নছিরদ্দিন চেরাগ দেহ্‌লি এই পঞ্চজন।

জন্য জড় হইত। সেই পাদুকা দুটী চোখে মুখে বুলাইয়া সকলেই আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। ঐ কারণেই দানাপুর মধ্যে আসদহাম উপলক্ষে পাদুকা দর্শন অভিলাষে সহস্র সহস্র লোকের সমারোহ হইত। একবার আবুল মজাফ্‌ফার দিল্লী দর্শন মানসে পাদুকা দুটী ও পিরহানটী গাঁঠরিতে বান্ধিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যে সময় তিনি দিল্লী সহরে উপস্থিত হইলেন। সে সময় বড়ই গোলযোগ। ঐ সময় খোরশান অধিপতি সম্রাট নাদের সাহ পারস্য-রাজ্য জয় করিয়া এবং বহু সংখ্যক পারস্যবাসী সৈন্য লইয়া কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া, লাহোর অধিকার করিয়া কর্ণাল মহাম্মদ সাহ্‌কে পরাজিত করেন। মহাম্মদ শাহ দিল্লীরাজ, নাদির শাহার স্মরণাপন্ন হইলে, নাদির শাহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লি রাজধানি আক্রমণ করিতে আইসেন। নাদির সাহ যখন সৈন্যসহ পথে আসেন তখন দিল্লিবাসীগণ সংবাদ পাইয়া, প্রাণের ভয়ে ও ধন লুণ্ঠনের ভয়ে একেবারেই সসাঙ্কিত হইয়া পড়িল। ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, ঘর কন্নার জিনিষপত্র ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিবার জন্য সহরে ছুটাছুটী পড়িয়া গেল। আবুল মজাফ্‌ফার সহরবাসীদের ছুটাছুটী দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমিত ফকির মানুষ, তাহাতে আবার বিদেশী লোক,

সঙ্গে এমন কিছু সম্পত্তি নাই যে, ভাবনা করিতে হইবে। যেখানেই থাকিনা কেন, ও সব ভাবনা করিবার আবশ্যক কি। তবে একটী ভাবনা টাকাকড়ি হইতেও অধিক; আমার ঐ গাঁঠরিতে পাদুকা ও পিরহান যাহা আছে, তাহা যদি কোন পাষণ্ড সৈনিক কাড়িয়া লয় তখন কি করিব। যদি এমন দুর্লভ বস্তু হারাইয়া বসি তবে আমার শূন্য জীবনেই বা কি ফল। তাহা হইতে আগেই সতর্ক হওয়া ভাল, কথায়.বলে সাবধানের বিনাশ নাই। আবুল মজাফ্‌ফার অনেকক্ষণ ভাবা চিন্তার পরে, মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিলেন যে, আমার গাঁঠরি নবাব জেকরিয়া খান বাহাদুরের বাটীতে গচ্ছিত রাখিয়া আসি, তিনি সৎচরিত্র স্বভাবের লোক, শুনেছি পরবস্তু প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষা করেন। দ্বিতীয়ত উঁহার ওখানে কোন শত্রুর ভয় নাই, দুর্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকেই প্রাচীর, দ্বারে শত শত সৈন্য দ্বার রক্ষকে নিযুক্ত, অর্থাৎ তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মান্যমান লোক, অগ্রে হইতেই নাদির শাহার সহিত পত্রের দ্বারায় একটা বন্দবস্ত করিয়া রাখিবেন। সৈয়দ মজাফ্‌ফার সাহেব এই মনে করিয়া গাঁঠরি হস্তে নবাব সাহেবের নিকটে গিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, হুজুর! আমার গাঁঠরিটী গচ্ছিত রাখিবেন? নবাব বাহাদুর

জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এ গাঁঠরিতে কি আছে? সৈয়দ সাহেব কহিলেন ইহাতে আমার দুই প্রকার অমূল্য বস্তু আছে, প্রথম প্রকার হজরত বড়পীর সাহেবের পাদুকা, দ্বিতীয় প্রকার তাঁহার পবিত্র অঙ্গের একটী পরিচ্ছদ। ইহা শুনিয়া নবাব সাহেব বলিলেন, আচ্ছা রাখিয়া যান তজ্জন্য আপনাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না, চাইবা মাত্রেই আপনার বস্তু আপনি পাইবেন। সৈয়দ সাহেব চলিয়া গেলেন। নবাব বাহাদুর অতি যত্নসহকারে সেই গাঁঠরিটী লইয়া আপনার ধনাগারে রাখিয়া দিলেন। এদিকে নাদের সাহ সৈন্যসহ দিল্লিতে প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইতে লাগিল তাহা লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল। নাদের সাহ একাদশ উনচল্লিশ হিজরীতে দিল্লি লুণ্ঠণ করিয়া অপরিমিত ধনরাশি লইয়া পারস্য অভিমুখে গমন করিল। যখন তাহারা লোকের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল তখন সহরে শান্তি স্থাপিত হইল। প্রাণভয়ে যেখানে যে পলাইয়াছিল, একে একে সকলেই আসিয়া আপনার ঘরবাড়ী সাবাইয়া বাস করিতে লাগিল। পরে সৈয়দ সাহেব নবাবের কাছে গাঁঠরি চাহিলে, নবাব সাহেব জামা ও জুতা যোড়াটী খুলিয়া রাখিয়া যেমন কার

গাঁঠরি তেমনি ফেরৎ দিলেন। সৈয়দ সাহেব গাঁঠরি লইয়া আপন গৃহে পৌঁছিলেন। অনেক দিবস অবধি জুতা ও জামা না দেখিয়া পাগল প্রায় হইয়াছিলেন, ওজু ও অবগাহন করিয়া তাড়াতাড়ী গাঁঠরি খুলিয়া দেখিলেন যে, পিবহান ও পাদুকা কিছুই নাই, খালি গাঁঠরি মাত্র আছে, তখন হতাশ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে নবাবের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পরে এশার নামাজ পড়িয়া মনদুঃখে ঐ বিছানাতেই শুইয়া পড়িলেন তখনই চক্ষে তন্দ্রা আসিল। কতকক্ষণ পরে হজরত বড় সাহেবকে দেখিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে হজরত বড়পীর সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। যখন চারচক্ষু একত্রে হইল বড়পীর সাহেব বলিলেন, মজাফ্‌ফার! তুমি আমার পরিচ্ছদ ও পাদুকার জন্য কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছ? আমার পাদুকা ও জামা তোমার গৃহের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নবাবের সাধ্য কি যে, আমার পাদুকা ও জামা অপহরণ করিয়া রাখিয়া দেয়। সে যেমন তোমার সঙ্গে ধূর্ত্ততা করিয়া চাতুরি করিয়াছিল, দেখিতে পাইবে কিছুদিন পরেই এই ধূর্ত্ততার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মজাফ্‌ফার

তখনই উঠিয়া পরিচ্ছদ ও পাদুকা দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। এদিকে অল্পদিন মধ্যেই পীরের কোপে নবাব সাহেব সমস্ত ধন জন হারাইয়া ভিখারির বেশে দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সদাসর্ব্বদা মুখে কেবল হায় হায় করিতে লাগিল সহর বাজার গলি গলি ফিরিলেও কেহ এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতনা। যাহারা তাহার সে ধূর্ত্ততা জানিতে পারিয়াছিল, তাহারা তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। অবশেষে দোকানে বাজারে ভিক্ষা না পাইয়া, দিল্লির জামে মসজেদে বসিয়া পয়সা পয়সা করিয়া চীৎকার ছাড়িত, তাহাতে কেহবা দিত কেহবা না দিত কিন্তু ঐ অবস্থাতেই হতভাগ্য নবাব চেঁচায়ে চেঁচায়েই মারা পড়িল।

বড়পীর সাহেবের পীরি সেজরা।

গওসল আজম সৈয়দ মহিউদ্দীন আব্‌দোল কাদের জিলানী বড়পীর সাহেবের পির (গুরুদেব) শেখ আবু সৈয়দ মখজুমি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবি হাসেন কোরশি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবুল ফারেয় তরতুসি (রঃ), তাঁহাব পির শেখ আবিল ফাজেল আব্‌দোল ওহাদ তোমুমি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আব্‌দোল আজিজ তোমুমি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবি বকার শিব্‌লি (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ তায়েফ জনিদ বোগ-দাদি (রঃ), তাঁহার পিব শেখ আবি হাসেন সরি সকৃতি (রঃ), তাঁহার পির শেখ মারুফ করখি (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম আলি রেজা (বঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম মুসা কাজেম (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম জাফর ছাদেক (বঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম বাকের (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম জয়নাল আবে-দিন (রাজিঃ), তাঁহার পিব সৈয়দ এমাম হাসিন (রাজিঃ), তাঁহার পির হজরত আলি কবমুল্লা অজহু, তাঁহার পিব হজরত মহাম্মদ রসুলোল্লা সাল্লোল্লাহো আলায়হেচ্ছালাম।

সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

সমাপ্ত।